পঞ্চম অধ্যায়

আশি ও নব্বই-এর দশকে নির্বাচিত উপন্যাসে আখ্যানের বিবর্তন

বিশ শতকের সাহিত্য আলোচনার সমালোচনা তত্ত্বের একটি ভাগ আখ্যানতত্ত্ব বা narratology । আখ্যান অথবা বক্তব্য কাহিনি পাঠকৃতি, কথন সংক্রান্ত সমস্ত তত্ত্ব আখ্যানতত্ত্বের মূল বিষয়। প্রাচীনকালে বিভিন্ন দার্শনিক, সমালোচক আখ্যানতত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা করলেও আখ্যানের স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি এই বিশ শতকেই। প্রয়োগতত্ত্বে সাহিত্যিকরা মূলত সময়গত বিন্যাস এবং যুক্তি শৃঙ্খল বিশ্লেষণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যদিও আখ্যান শুধুমাত্র শব্দ বা কাহিনির মেলবন্ধন নয় শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যমে আখ্যান প্রাধান্য পেয়েছে। বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্ব মূলত সংগঠনবাদ তত্ত্বের নিরিখেই গড়ে উঠেছে। আমার গবেষণা সন্দর্ভের মূল বিষয় আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণ এবং পুনর্বিচারে। সময়ের স্বল্পতার কারণে এত স্বল্প পরিসরে এই বৃহৎ আলোচনা প্রায় অসম্ভব। তাই কিছু নির্বাচিত অংশের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হল।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে অতি আধুনিকত লেখিকা সুচিত্রা ভট্টাচার্যের সময় পর্যন্ত প্রকাশিত নির্বাচিত কিছু উপন্যাস থেকে তত্ত্ব নির্মাণার্থে কিছু আলোচনার চেষ্টা করা হল।

বাংলা সাহিত্যে স্বার্থক উপন্যাস রচয়িতা বললে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামই প্রথমে আসে। এর আগে উপন্যাস রচনার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তা সার্থকতা লাভ করতে পারিনি। যেমন—প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল', কালীপ্রসন্ন সিংহ-এর 'হুতোম পেঁচার নকশা' ইত্যাদি।

বঙ্কিম উপন্যাসে আখ্যানের কিছু বাঁধাধরা নিয়ম ছিল। তবে তারও কিছু ভাগ আছে। বঙ্কিম পরবর্তীগণ একেই অনুসরণ করেছেন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ, তাঁর প্রথমদিকের রচনা বঙ্কিম অনুসারী যেমন 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৭)। তবে 'চোখের বালি' তে (১৯০৩) গিয়ে আমরা পরিবর্তন লক্ষ করি। এরপর থেকে উপন্যাসের আখ্যান ভাবনা বদলে যায়। আবার শরৎচন্দ্র-এ গিয়ে অন্য আখ্যান দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবে সময়ের সাথে সাথে যেমন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি উপন্যাসের আখ্যান ভাবনাও বদলে গেছে। বন্দ্যোপাপাধ্যায় ত্রয়ীর কথা উপন্যাস সংক্রান্ত আলোচনা না করলেই নয়। প্রত্যেকের রচনায় আখ্যানের বিষয় এবং গঠন বদলে গেছে। বিভূতিভূষণের 'ইছামতী', তারাশঙ্করের 'গণদেবতা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'দিবারাত্রির কাব্য' প্রত্যেকটি উপন্যাসে আখ্যান নতুনভাবে, নতুন রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমানকালে আখ্যানের বদল ঘটেছে আরো ব্যাপক হারে।

আখ্যান সম্পর্কিত ভাবনার সূত্রপাত হয় বিশ শতকের পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বের হাত ধরে। লেখক বা শিল্পী তাঁর সৃষ্টি কর্মের সময় সচেতনভাবে তত্ত্ব নিয়ে ভাবেন না। বিষয়কে উত্তীর্ণ করে যাওয়াই তাদের কাজ। কিন্তু আমরা বিষয়ী লোকেরা বিষয় নিয়েই বেশি ভাবনাচিন্তা করি, আর তার থেকে উদ্ভূত হয় তত্ত্বের আলোচনা। সাহিত্য আসলে কথার শিল্প। উপন্যাসের বিষয় কী, নাটকে, কবিতায় কী বলা হয়েছে তা শিল্পের উপকরণ মাত্র। প্রকরণই শিল্প, শিল্পের বহিরঙ্গ আয়োজনকে যা অনিবার্য করে তোলে। কোন উপন্যাস কেন উপন্যাস—এ প্রশ্ন সচেতন পাঠকের মনে আসতেই পারে, হয় তো এমন কোনো চিন্তা থেকেই বর্তমানে আখ্যান ব্যাখ্যায় একটি স্বতন্ত্র প্রস্থানের জন্ম হয়েছিল, যাকে আখ্যানতত্ত্ব বলে অভিহিত করা চলে। মূলত ভাষার সংগঠন নিয়ে আলোচনার সূত্রে তার জন্ম। যদিও কখনো প্রয়োগবাদী দর্শন, চিহ্নবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব কিংবা লোকসংস্কৃতি নানাবিধ বিদ্যার মিলিত ভূমিকায় এর তত্ত্বকাঠামোটি গড়ে উঠেছে। আখ্যানের গঠন ও রীতিকে তার রূপায়ণ প্রক্রিয়া থেকে বুঝে নেওয়ার এক তাগিদ তৈরি করে এ তত্ত্ব। কোনো উপন্যাসের আখ্যানকে অবশ্যই তার লেখক বা কার্য সামাজিক ও ঐতিহাসিক পটভূমির সাপেক্ষে বিচার করা সম্ভব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও আছে। এতে আখ্যানের

নিজস্ব শিল্প কৌশলের মূল্যায়ন নাও হতে পারে। তাই শিল্পকর্মকে সবসময় তত্ত্ব বা ব্যাকরণ দিয়ে বিচার করা যুক্তিসম্মত নয়।

আখ্যানতত্ত্ব একদিকে যেমন আখ্যানের মধ্যেকার সাধারণ মিলের ক্ষেত্রগুলি নির্ধারণ করতে চায় তেমনি তাদের মধ্যেকার অমিলগুলিও নির্ধারণ করতে চায়। আমাদের মনোযোগের লক্ষ উপন্যাসের মধ্যে আখ্যানগুলির বিস্তার। তার মধ্যে আখ্যানের গঠন বৈশিষ্ট্য কতটা রক্ষিত হয়েছে, আখ্যানের প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন কীভাবে ঘটছে, তারই আলোচনা আমরা এই অধ্যায়ে করতে পারি। উদাহরণ হিসাবে বিশ শতকের আশি ও নব্বই-এর দশকের কিছু নির্বাচিত উপন্যাসকে ব্যবহার করা হয়েছে।

আখ্যানতত্ত্ব সম্পর্কে জেরল্ড প্রিন্স বলেছেন—

> "The (structuralist-inspired theory of narrative. Narratology studies the nature, form, and functioning of narravtive (regardless of medium of representation) and tries to characterize narrative competence."[১]

তত্ত্বের বহুমাত্রিকতা ও আখ্যানতত্ত্বের বিভিন্ন জটিল রূপ নির্মাণ করেছেন সমালোচকেরা। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল নারীবাদী আখ্যানতত্ত্ব, স্বাভাবিক আখ্যানতত্ত্ব, সমাজ আখ্যানতত্ত্ব, মনো আখ্যানতত্ত্ব। এছাড়া আরো ভিন্ন পরিসরে আখ্যানতত্ত্বের বিস্তার ঘটেছে। নারীবাদী আখ্যানতত্ত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' ও অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী'। সমাজ আখ্যানতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত 'আকাশের নীচে মানুষ' স্বাভাবিক আখ্যানতত্ত্বের সাথে যেতে পারে গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই।'

আখ্যানের একটি অন্যতম অংশ হল আখ্যানতত্ত্ব। যে বৈশিষ্ট্যের কারণে একটি আখ্যান আখ্যান হয়ে উঠে তা হল আখ্যানতত্ত্ব।

'আকাশের নীচে মানুষ' উপন্যাসে প্রধান হয়ে উঠেছে সময়। জমিদারতন্ত্রের অবসান ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন ধরা পড়েছে 'আকাশের নীচে মানুষ' উপন্যাসে। ফিউডালইজমের

অবক্ষয় ও ডেমোক্রেসির সূচনা হলেও শোষক এবং শোষিতের অবস্থান কিন্তু একই রয় গেছে। শোষক বিনা শর্তে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে আর শোষিত খেটে চলেছে। জমিদারই হয়ে উঠেছে সহৃদয় ভোট প্রার্থী। এখানে শোষণের বহুমাত্রিক রূপ দেখা দিয়েছে। জমিদার সরাসরি নিষ্ঠুর উপায়ে শোষণ চালিয়েছে আর সেই জমিদারই যখন ভোটপ্রার্থী তখন তার শোষণের বহুমুখী পরিবর্তন লক্ষণীয়। প্রজারাই হয়ে উঠেছে ভোট ব্যাঙ্ক। তাই ভোট আদায় করে প্রশাসনের মাথায় বসে ছড়ি ঘোরানোর মজা উপভোগ করতে চেয়েছেন। মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয়েছে ভোটের প্রেক্ষিতে। একটা ভোটের দাম—একটা মানুষের দাম। মানবিক কোনো কিছু নির্ধারণ মূল্য পায়নি।

> ''একদিকে রাঁচী পাটনা হাইওয়ে, অপরদিকে ছোটনাগপুর পাহাড়ের ধুমল উপস্থিতি। তারই মাঝখানে গারুদিয়া মৌজা। এই তালুকের মালিক রাজপুত ক্ষত্রিয় রঘুনাথ সিং। প্রজাপীড়ক অত্যাচারী রঘুনাথ সিং-এর জমিতে চাষ করে অনেক বেগার খাটা জমিদার। তাদেরই একজন ধর্মা। রঘুনাথ সিংহ-এর তালুকে মানুষ বা জন্তুর কোনো রেহাই নেই। জ্যৈষ্ঠের কাটফাটা রোদ্দুরে পাষাণ কঠিন জমিতে লাঙল দিচ্ছে দুটি বয়েল আর একটি ভূমিদাস। এই দৃশ্য বিঘার পর বিঘা জুড়ে। এই অত্যাচারী জমিদারের জমিনে চাষ আবাদের হাল মান্ধাতা আমলের, সেই বয়েল আর লাঙল। ...এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে জমি চাষ ভূমিদারেরা। 'আদমী নায় বাঁচেগা, নায় বাঁচেগা'—একথা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর মাঠ চষে জমিদাসের দল। তারা পুরুষাক্রমে জমিদারের কাছে বিক্রীত। এদের দুঃখ বেদনা কষ্টের নিপুণ ছবি এই উপন্যাস। একদিকে গরীব জমিদাসেরা। গারুদিয়ার জমিজমা গাছ-গাছালি পশুপাখি নদী নহরের মতো অচ্ছুৎ ভূমিদাসেরা জমিদারের খাসতালুকের সম্পত্তি। তাদের মেয়েরাও জমিদারের সম্পত্তি, তিনি তাদের ইচ্ছেমতো ভোগ করতে পারেন। এই ইচ্ছে মতো শোষণ ও ভোগে বাগড়া দিলে গণা দোসাদ, যে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল শহরে, কাজ নিয়েছিল কারখানায়। তার ফিরে আসাও চলে

যাওয়ার মধ্যে দোসাদ-সমাজে অনেক কিছুর বদল হল। মনে মনে। জমিদার এম.এল.এ. হতে চান, তা নিয়ে দোষাদরের জীবনে নাড়া পড়ল। চুনাও এর প্রার্থীরা এই গরীবরদের পীড়ন করে।"[২]

গৌরকিশোর ঘোষ-এর এর 'প্রেম নেই' উপন্যাসে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষের কথা, বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইনের কথা বারবার আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতির কথা উঠে এসেছে। উঠে এসেছে নারী নির্যাতনের কথা। স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপট 'প্রেম নেই' উপন্যাসে আলোচিত হয়েছে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে মুসলমান চাষীদের করুণ অবস্থার কথা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে নয়, রাজনৈতিক, মানসিক প্রেক্ষিতে, সাধারণ মানুষের ওপর প্রবল অত্যাচার ঘটিয়ে চলেছে। 'প্রেম নেই' উপন্যাসটিতে লেখক মূলত ১৯২২-২৩ সাল থেকে ১৯৪৮ সালের সময়সীমাকে লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী দেশের, বিশেষ করে অখণ্ড বাংলার রাজনীতি, সমাজব্যবস্থাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। সমস্যাদীর্ণ বাংলার মানুষের করুণ পরিণতির কথা উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে বারে বারে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। একটি বিষয়ে লেখক জোর দিতে চেয়েছেন তা হল বাংলার মুসলমান সমাজ এবং তাদেরকে কেন্দ্র করে রাজনীতির আবর্ত। ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির বলি হয়ে মানুষের দুর্দশার ছবি উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে।

নব্বই-এর দশকে আলোচিত উপন্যাসগুলির অন্যতম 'দহন', 'রাধিকাসুন্দরী', 'দেখি নাই ফিরে' মূলত নারীবাদী প্রেক্ষিতে আখ্যান ভাবনা ও আত্মজীবনীর প্রেক্ষিতে আখ্যানের সামাজিক পরিসরভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

আধুনিক জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়েছে নারীচেতনাবাদী শাস্ত্র। এটা কোনো স্বতন্ত্র শাস্ত্র নয়, প্রত্যেক শাস্ত্রের সঙ্গে এর যোগাযোগ। Interdisciplinary Approach র মাধ্যমে এই চেতনাকে যদি জাগ্রত করা যায় তাহলে সমাজ পরিসরে উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। নারীচেতনাবাদী তত্ত্ব কোনো স্বতন্ত্রতত্ত্ব নয় বা শাস্ত্র নয়, এর Approach co-related যদিও এটা কোনো আধুনিক বিষয় নয়, যেদিন থেকে অত্যাচার শুরু সেদিন থেকে প্রতিবাদ ও শুরু

হয়েছে নারী তার প্রতিবাদ করেছে নিজের মতো করে। সুতরাং এটা কোনো নতুন সমস্যা নয় এই সমস্যা চিরকালীন, তবুও লেখিকা আখ্যানকে ধরার চেষ্টা করেছেন নারীচেতনাবাদী প্রেক্ষাপটে দহন উপন্যাসে বারবার দেখা গেছে পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যবাদ এবং তার সাথে সাথে নারীরাই নারীদেরকে আটকে রেখেছে। যেখানে ঝিনুক, রমিতার জন্য আন্দোলন করতে গেছেন আইনি পদক্ষেপ নিতে চেয়েছেন সেখানে রমিতাই ঝিনুকের পাশ থেকে স্যার আসতে বাধ্য হয়েছেন। সামাজিক চাপে পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে রমিতা নিজের প্রতি হয়ে যাওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেননি। একজন পুরুষ তার জীবনসঙ্গীর crisis-র জায়গাটা বোঝার চেষ্টাই করেনি। তারা প্রত্যেকে নিজেদের male ego satisfy করতে সদা ব্যস্ত থেকেছে। সমস্ত দায়-দায়িত্ব-কর্তব্য চাপিয়ে দিয়েছে তাদের জীবনের স্ত্রী সঙ্গিটির উপর। আত্মসম্মান থেকে পারিবারিক সম্মান রক্ষা অর্থাৎ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবটাই করতে হবে পরিবারের মহিলা সদস্যটিকে। কিন্তু পরিবর্তে সে এতটুকু ন্যায় পর্যন্ত আশা করতে পারে না। পুরুষের মন জুগিয়ে চলতে পারলেই নারীর জীবনের সার্থকতা পরম প্রাপ্তি। এর অন্যথা ঘটলেই সমস্ত হিসাবে যেন গরমিল, এই আখ্যানের পটভূমিতেই নারীর অবস্থানের কথা ঔপন্যাসিক কিছুটা হলেও ধরতে চেয়েছেন। বর্তমান সময় ও সমাজ পরিসরের প্রেক্ষিতে নারীচেতনাবাদের প্রভাব একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আখ্যানের ভাষায় উঠে এসেছে এইসমস্ত ভাবনা। উপন্যাসে হয়ত শেষ পর্যন্ত নারীর জয় হয়নি, কিন্তু নারীর জয়ের নিমিত্ত এই আলোচনা। উত্তর আধুনিক যুগে পৌঁছেও নারী আজ স্বাধীন নয়। নারীকে সচেতন করার তাগিদেই হয়ত লেখিকার এই সামান্য প্রয়াস।

'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাস নারীচেতনাবাদী প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন নারীর জীবনসংগ্রামের লড়াই-এর দলিল 'রাধিকাসুন্দরী'। অত্যন্ত গ্রামের অশিক্ষিত মেয়ে নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কারণে স্বতন্ত্র identity তৈরি করতে কিরণময়ীর বাড়িতে পরিচারিকার কাজ নেয়। তারপর সে জীবনযুদ্ধে বারবার পুরুষের কাছে হেরে যেতে থাকে কারণ তাকে ভোগ করে পাঁচশো টাকা ধরিয়ে দেয় বাবন। একজন নারীকে পুরুষ এভাবে ভোগ্যবস্তুতে পরিণত করে। তারপর খানিকটা নিজের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তে শিবুর কাছে রাধা পণ্যায়িত হয়।

একটা মেয়ের জীবনে চরম ওঠা পড়ার কাহিনি রাধিকাসুন্দরী। রাধার অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছে পরি। পরি এখানে সকলের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রতিবাদ করেছে। নিম্ন শ্রেণিভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সর্বোপরি নারী জাতির অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে পরির এই প্রতিবাদ এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কিন্তু রাধিকাসুন্দরী নিজের মতো করে কিছুটা প্রতিবাদ করেছে ঠিক-ই। কিন্তু পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেননি। তেমনি, কিরণময়ী উচ্চবিত্তের প্রতিনিধি হয়েও এর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেননি। পুত্র বাবানকে প্রকৃত শিক্ষাটুকুও দিতে অক্ষম হয়েছেন। নারীচেতনাবাদী আলোকে অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী' উপন্যাস একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত বহন করে চললেও, আখ্যানের ক্ষেত্রেও এ এক অভিনব দৃষ্টান্ত। ঔপন্যাসিকের, নারীচেতনাবাদী প্রেক্ষিতে আখ্যানের এ এক অভিনব বিস্তার।

বিবর্তনের ক্ষেত্রে উপন্যাসগুলি সময় ও সমাজ পরিসরকে যেভাবে চিহ্নিত করেছে তা এক কথায় অনবদ্য।

বিশ শতকের একটি আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব আখ্যানতত্ত্ব বা Narratology। মূলত পাশ্চাত্য সাহিত্য আলোচনার সূত্রেই বাংলা সাহিত্যে আখ্যানতত্ত্বের সূত্রপাত। বিশ শতকে সাহিত্য আলোচনার একটি নতুন ধারা হিসেবে আখ্যানতত্ত্ব আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে। ফরাসি শব্দ Narratologie থেকেই ইংরেজি Narratology শব্দের উৎপত্তি। অতএব আখ্যানতত্ত্বের মূলও সেই ইংরেজি তত্ত্বেরই বাংলারূপ। বর্তমানে বাংলা সাহিত্য আলোচনায় আখ্যানতত্ত্ব একটি বহুল পরিচিত রূপ। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব সংগঠনবাদ বা Structuralism-এর হাত ধরেই আখ্যানতত্ত্বের সূচনা। আবার অনেকে মনে করেন ভাষার সংগঠন এর সূত্রেই এই নতুন তত্ত্ব প্রস্থানটির আবির্ভাব। সমালোচকদের মধ্যে এই তত্ত্ব প্রস্থানটি নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। তাই সর্বসম্মত রূপে কোনও সজ্ঞায় আজও আমরা পৌঁছতে পারিনি। তাই আখ্যানতত্ত্ব বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। সাধারণ আখ্যানতত্ত্ব, সমাজ আখ্যানতত্ত্ব, মনো আখ্যানতত্ত্ব, নারীবাদী আখ্যানতত্ত্ব ইত্যাদি একাধিক বিষয়ে আখ্যানতত্ত্বের আলোচনা সমান্তরাল চলতে থাকে। এর ফলে বিষয়টি আরও জটিল অবস্থানে পৌঁছেছে। তবে সাধারণ অর্থে আমরা যা বুঝি, কোনও ঘটনার বা

বিষয়ের বর্ণনা, বিবরণ, কথন, কথক, গ্রাহক এইসব একাধিক বিষয় আখ্যানের সঙ্গে জুড়ে গেছে। কোনও নির্দিষ্ট সজ্ঞায় আখ্যানকে বাঁধা যায় না। কোনও জীবিত সাহিত্য ধরণকেই নির্দিষ্ট সজ্ঞায় বাঁধা যায় না। কারণ তা নিয়ত পরিবর্তনশীল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আখ্যানের সজ্ঞাও বদলে যায়। আখ্যান বিভিন্নরূপে নানা বিষয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়।

সংগঠনবাদের সূত্রে আখ্যানতত্ত্বের আবির্ভাবের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁরা আখ্যানকে দ্বিস্তরিক কাঠামোয় বিন্যস্ত করেছেন। একটির নাম দিয়েছেন কাহিনি বা story, অন্যটিকে বলেছেন সন্দর্ভ বা discourse। ঘটনার কালানুক্রমিক বর্ণনাকে কাহিনি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সেই কাহিনির উপস্থাপন রীতিকে সন্দর্ভ বলে অভিহিত করেছেন। কাহিনি এবং সন্দর্ভের মিলিত প্রকাশিত রূপই আখ্যান, এই বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। অনেকে আখ্যানকে মাধ্যম নিরপেক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, শুধুমাত্র লিখিত বয়ানেই আখ্যান উপস্থিত থাকে এমনটা নয়। একই আখ্যান বিভিন্ন মাধ্যমে পরিবর্তিত রূপ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। তবে লেখ্য সাহিত্যে, আখ্যান বলতে কাহিনি, পাঠকৃতি এবং কথক-এর সুসম্পর্ক যুক্ত সমন্বয়। কোন একটিকে বাদ দিয়ে আখ্যান নামক বিষয়টি দাঁড়াতে পারে না।

আধুনিক পূর্ব বাংলা সাহিত্যে আখ্যানকাব্যের প্রচলন ছিল এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য খুঁজলে আমরা প্রচুর আখ্যান কাব্যের সন্ধান পাই। সেখানে মূলত দেবদেবী মাহাত্মা জ্ঞাপক কথাই প্রচলিত ছিল। মনসা, চণ্ডী, শিব, ধর্ম ইত্যাদি একাধিক দেবদেবীদের নিয়ে একাধিক লেখক তাঁদের লেখনী ধারণ করেছেন। তবে তা ছিল মূলত পদ্যের আকারে। সেগুলি ছিল মূলত গেয় কাব্য। অতএব সেখানে সেভাবে পাঠক ছিল, যা ছিল তাদের আমরা 'শ্রোতা' শব্দের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে পারি। আধুনিক পূর্ব যে আখ্যান সাহিত্য ছিল তার কিছু ধরাবাঁধা গত ছিল। সেখানে লেখক সেই গতের বাইরে বেরোতে পারেননি। যে কাহিনিই লিখুন না কেন সেই পরিচিত ছকেই তার বর্ণনা দিয়েছেন। শুধুমাত্র মনসার কাহিনি নিয়ে একাধিক আখ্যানকাব্য রচিত হয়েছে। কাহিনির হেরফেরও ঘটেছে কিন্তু ফর্মের কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। সমসাময়িক অন্যান্য দেবদেবী মাহাত্মজ্ঞাপক আখ্যানকাব্য গুলিই একই ধারার পরিচয় বহন করে চলেছে। এই ধারা আঠারো শতকের শেষ দিক পর্যন্ত

প্রবাহিত ছিল। শেষতম নিদর্শন হিসেবে আমরা 'অন্নদামঙ্গল'-কে ধরতেই পারি। এর প্রায় একশো বছর পর আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে ইংরেজি নভেল অনুকরণে উপন্যাস নামক একটি নতুন ফর্মের সন্ধান পেলাম। এই ধারাও বহুদিন যাবৎ প্রচলিত ছিল। আমাদের পুরনো সাহিত্য ধারাকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ বিদেশি ধরনের একটি সাহিত্য ধারা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হয়ে গেল। আজও অল্পবিস্তর সেই ধারা আমরা বহন করে চলেছি। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা মাঝে মাঝেই পূর্বের আখ্যান কাব্যগুলির মধ্যে উপন্যাসের ধরন খোঁজার চেষ্টা চালাই। চণ্ডীমঙ্গল নিয়ে এই আলোচনা আমরা প্রায়ই শুনতে পাই। সেভাবে সমৃদ্ধ আলোচনা কখনই শুনতে পাই না। আধুনিক উপন্যাস শুধুমাত্র ইংরেজি নভেলকেই অনুসরণ করেছে এবং এগিয়ে চলেছে।

উপন্যাস বলতে আমরা কী বুঝি? কাকে উপন্যাস বলব? বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে। তার পূর্বে যা ছিল তাকে আমরা কাব্যের আকারে পেয়েছি। তারপর যখন গদ্যের প্রকার এল তখন থেকেই উপন্যাস আমরা পাই না। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আখ্যান কাব্যের প্রায় সমাপ্তি। তারপর প্রায় একশ বছর পর, সার্থক উপন্যাসের ফর্ম পাই। এই মধ্যবর্তী সময়ে অনেক গদ্য রচনাই আমরা পেয়েছি তবে তাকে ঠিক উপন্যাস হিসেবে মান্যতা দিতে পারিনি। প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসাদ সিংহ এই প্রয়াস করেছেন। তবে তাঁরা ঠিক নভেলের ফর্মে রচনা করতে সমর্থন হননি। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র নভেলের অনুসরণে প্রথম উপন্যাস উপহার দেন। উপন্যাস বলতে আমরা বিবরণধর্মী রচনাকেই বুঝি। প্রত্যেক ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা থাকে। হাজারো চরিত্র, ঘটনার মধ্যে দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। তবে তিনি বাস্তব আর কল্পনার বিষয়ে নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। বাস্তবের তুলনায় তাঁর রচনায় কল্পনার আধিক্য বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যায়। উপন্যাস যেহেতু চলমান একটি শিল্পরীতি তাই উপন্যাসের কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা তৈরি হয়নি। তবে কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করে উপন্যাস নাম দেবার চেষ্টা করি মাত্র। কোনও লেখক উপন্যাস লিখতে বসেন না, বসেন একটি কাহিনি লিখতে, গল্প বলতে। বলতে বলতে তাঁর মধ্যে আরও অনেক বিষয় চলে আসে। লেখক তাঁর নিজস্ব লেখ্য রীতি অনুযায়ী আখ্যান বর্ণনা

করেন। তাই একই আখ্যান লেখক ভেদে তাঁর আততি পাল্টে যায়। ভিন্ন আবেদন নিয়ে আমাদের সামনে উঠে আসে। পাঠক তার ভাবনা অনুযায়ী আখ্যান পাঠ করেন এবং তার ভাব গ্রহণ করেন।

উনিশ শতকের বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র একাধিপত্য বিস্তার করেছেন। পরবর্তী ঔপন্যাসিকগণ সেই রীতিকেই অনুসরণ করেছেন। সময়, সমাজ, পরিবেশ, চরিত্রনির্মাণ, প্লট, সাবপ্লট নির্মাণে বঙ্কিম অনুসারী প্রায় সকলেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম জীবনের উপন্যাসে তাঁকেই গুরু মেনে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়েছেন। তবে তা ধরে বসে থাকতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ একাধারে কবি, অন্যদিকে দার্শনিকও বটে। তাই তিনি যখন উপন্যাস রচনা করেছেন তখন তাঁর দর্শন উপন্যাসে প্রভাব পড়বে তা-ও তো খুব স্বাভাবিক। 'চোখের বালি'-তে গিয়ে সেই অনুসরণ মুক্ত মনের পরিচয় পাই। পূর্বের 'বউঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষী'-তে সেই ইতিহাস এবং রোমাঞ্চের মেলবন্ধন পাই। একটা নিটোল কাহিনি। আদি-মধ্য-অন্ত মুক্তপ্লট এবং তার সহযোগী একাধিক সাবপ্লট এবং একটা পরিণতি দিয়ে গল্পের সমাপ্তি। কিন্তু বেশি দিন এই ভাবনায় চালিত হতে পারেননি। বিশ শতকের প্রথম দশকেই লিখলেন 'চোখের বালি' (১৯০৩)। সেখানে ইতিহাস এবং রোমান্সকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে সমাজের দিকে নজর দিলেন। সম্পূর্ণ সামাজিক বিষয় নিয়েই এই উপন্যাস। সমাজের বাস্তব কাহিনির উপর ভিত্তি করেই নির্মাণ করলেন এই উপন্যাস। শুধু মানুষের বাইরের দৃশ্যই নয়, মানুষের মনের ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমরা কতটা সামাজিকতা হ্রাস করতে বলি তার কতটা ভিতরেই অর্থাৎ মনের মধ্যেই চেপে যাই তারই পরিচয় উদঘাটনে নামলেন। বঙ্কিম ভাবনাকে সম্পূর্ণ দূরে ঠেলে এক নতুন ভাবনার উদয় করলেন বাংলা উপন্যাসে। সমাজ মানুষের জীবনের জটিলতা সামনে নিয়ে এলেন। ঠিক এর পরই রচনা করেন 'নৌকাডুবি' (১৯০৬) নামের উপন্যাস। সেখানে আবার তিনি পিছন দিকে হাঁটলেন।

এর কারণ তিনিই বলতে পারতেন। তবে মানুষের মন যে একই সরলরেখায় চলে না তা আমরা বুঝতে পারি। তা না হলে তিনি একধাপ এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে আসতেন না। এরপর 'গোরা' উপন্যাসে তাঁর দার্শনিক মনেরই পরিচয় পাই। তিনি তাঁর উপন্যাসে বাস্তবতা এবং

আন্তঃবাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন বারে বারে। তবে সব ক্ষেত্রে যে সফল হয়েছে তা বলতে পারি না। 'চতুরঙ্গ' নামের উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। সেখানে অন্য রবীন্দ্রনাথকে পাই। শচীশ নামক চরিত্রটির চারটি অধ্যায় নিয়েই উপন্যাস। বারে বারে সে নিজেকে ভেঙেছে এবং গড়েছে। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার যাকে আমরা আত্মআবিস্কার বলে থাকি তার তাড়না শচীশের মধ্যে বারে বারে দেখতে পাই। এক শচীশ সম্পূর্ণ উপন্যাসে পাই না। ভিন্ন রূপে ভিন্ন বেশে শচীশকে আমরা পেয়েছি। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় আজও 'চতুরঙ্গ' প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে। এখানে তিনি সময়কে বদলেছেন। চিরাচরিত উপন্যাসের পথকে আবার নতুন করে নির্মাণ করেছেন। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা উপন্যাসে রূপ ও রীতির পালাবদল' বইয়ের প্রাক্‌কথন অংশে 'চতুরঙ্গ' সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন,

> ''রবীন্দ্রনাথ এই আধুনিক উপন্যাসটি লিখতে যে তিনটি উপায় অবলম্বন করেছেন, তার ব্যবহারও বাংলা উপন্যাসে প্রথম। অবচেতন, প্রতীক এবং সংলাপকে তিনি চরিত্রের নিঃশর্ত স্বাধীন বিবর্তন ঘটাতে ব্যবহার করেছেন। দিন ও রাত্রির, স্থল ও জলের মোহনায় চরিত্রের জন্মান্তর সাধিত হয়েছে। ইন্দ্রিয় নির্ভর জগত থেকে অবচেতনের অনুভূতিতে শচীশের বারবার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। শুধু তা-ই নয়, নির্বিশেষকে সে বিশেষরূপে পেতে চেয়েছে। বিশেষকে অতিক্রম করেই নির্বিশেষে যেতে চেয়েছে।''[৩]

সময়ের সাথে সাথে উপন্যাসের বিষয় পাল্টেছে। লেখক পাল্টেছেন, উপন্যাস রচনার রীতির পরিবর্তন ঘটেছে। সাময়িক পত্রের হাত ধরে উপন্যাসের একটা বিরাট পাঠক গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। অন্দরমহল থেকে উপন্যাস নেমেছে প্রকাশ্য রাস্তায়। আধুনিক যুগের যান্ত্রিক উন্নতি, জীবনযুদ্ধ, কঠিন কঠোর পরিস্থিতি পাঠককে রোমান্স-বিমুখ করে তোলে। এতদিন পাঠক গল্প শুনেই আনন্দ পেয়েছেন। তারা লেখকের বিরুদ্ধে কখনও প্রশ্ন তোলেননি। যা দিয়েছে তাই খোলা মনে মেনে নিয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুক্ত, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের যুগ। তারা প্রশ্ন করতে চায় কেন দিয়ে। এর পরই প্রশ্নের বাণে বিদ্ধ হতে থাকেন লেখক কুল। তাঁরা যুদ্ধ বিধ্বস্ত

পৃথিবীতে রোমান্টিক গল্পের স্বাদ নিতে অস্বীকার করেন। একদল লেখকও সেই মতেরই সমর্থন করেন। তাঁরা তীব্র রোমান্টিক বিরোধী। মূলত রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতায় একটি গোষ্ঠী তৈরি হয়। তারা সমাজের বিভিন্ন বিষয়কে সরাসরি পাঠকৃতিতে স্থান দিতে থাকেন। 'কল্লোল' পত্রিকা-এর প্রধান মাধ্যম হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। সমাজের নগ্ন বিষয়কে সরাসরি উপন্যাসে প্রকাশ করতে থাকেন। আমরা সাধারণ চর্মচক্ষুতে যা দেখি তাকেই উপন্যাসের বিষয়ে পরিণত করতে থাকেন। এই সময় ইংরেজরাও তাদের সাম্রাজ্য, মধ্যগগণে নিয়ে গিয়েছে। আমরা সম্পূর্ণরূপে কলোনির অন্তর্ভুক্ত। বিদেশি শক্তির হাতে শাসিত, শোষিত একটি জাতির সাহিত্যে রামান্টিক প্রবণতা চলতে পারে না। তাই সময়ের নিয়মেই সাহিত্যে ও তার পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

সাহিত্য সমাজের শিল্প, উপন্যাস সাহিত্যেরই একটি প্রকরণ। সে কারণে উপন্যাসে সমাজের ছবি প্রতিফলিত হবে, এটাই স্বাভাবিক। তা হলে উপন্যাসের প্রথম যুগে সমাজ কী সেভাবে উপন্যাসে ফুটে ওঠেনি? এর উত্তরে বলতেই পারি, সমাজ অবশ্যই আছে তবে তা বাস্তব সমাজ থেকে অনেক দূরে। সেখানে কল্পনার আধিক্য এতই প্রবল যে বাস্তব সেখানে গৌণ হয়ে গেছে। সেইসব উপন্যাস পাঠ করে আমরা আনন্দ পেয়েছি। হেসেছি, কেঁদেছি কিন্তু কোনও চেতনায় আঘাত করেনি। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তি হিসেবে গোরা হিন্দু। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের চরম নিন্দাই করেছেন তাঁর উপন্যাসে, চরিত্রের সাহায্য নিয়ে, তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা প্রায় সবাই সম্ভ্রান্ত বংশের। তাদের আচার-আচরণ, কথা বলা সমস্তই খুব উচ্চমার্গের। তার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করা প্রায় অসম্ভব। অনুসরণ করা যায় মাত্র। সমাজে শুধু উচ্চবর্গের, উচ্চবর্ণের মানুষ বাস করে এটা সত্যি নয় কিন্তু তারা সাহিত্য প্রকরণে ব্রাত্য থেকে গেছেন। তাদের কথা তাদের ভাষা সেভাবে বয়ানে উঠে আসেনি। যে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে মাটির কাছাকাছি যেতে চেয়েছেন তিনিও শেষপর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি বলেই মনে হয়। কারণ তাঁর উপন্যাসেও নিম্নবর্ণ বা নিম্নবৃত্তের কোনও পরিচয় সেভাবে আমরা পাই না। প্রধান চরিত্র বা বিষয় হিসেবে তারা কখনও স্থানও পায়নি।

সময়ের তালে উপন্যাসের রূপ বদলেছে। উপন্যাসের ভিতরকার মানুষগুলি বদলে

গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহকে তৈরি করে দেবীচৌধুরানী ইত্যাদি একাধিক মানুষকে নির্মাণ করেছেন। এভাবে রবীন্দ্রনাথও তাঁর ভাবনা দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে মানুষ নির্মাণ করেছেন। তবে এই মানুষগুলিকে ছোঁয়া যায় না। তারা সত্য হতেও পারে, নাও হতে পারে। একটা ধারণা আমাদের মনে তৈরি হয়। এইভাবেই লেখক তাঁর ধারণাকে লেখার মাধ্যমে পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেন। লেখককে বাদ দিয়ে লেখা টিকতে পারে না। লেখকই লেখার নির্মাতা। তাঁর সমস্তটাই নিজে হাতে গড়া। তবে লেখক যে তাগিদ দিয়ে লেখেন পাঠক সেই তাগিদ নিয়ে পড়েন না। দু'জনের তাগিদ আলাদা আলাদা। তা সত্ত্বেও কোথায় যেন একটা মিল আছে। আর সেই মিলের কারণেই একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজন টিকতে পারে না। উপন্যাসের লেখক মানুষ, উপন্যাসে মানুষের কথাই বলা হয়। উপন্যাসের পাঠকও মানুষ। তাই উপন্যাস সম্পূর্ণ মানুষকেন্দ্রিক। মানুষের জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়া উপন্যাসের একটা অন্যতম কাজ।

> ''উপন্যাস হচ্ছে মানুষের আয়না। আয়না তো মরা প্রতিবিম্ব ধরে, কিন্তু এমন আয়না যদি থাকত যেখানে জ্যান্ত জীবনকে ধরা যায়, তা হলে বলা যেত, উপন্যাস হল মানুষের জীবনের সেই রকম মায়া দর্পন।''[৪]

অর্থাৎ উপন্যাসের মধ্যে পাঠক নিজেকে খুঁজতে চায়। অপরপক্ষে লেখকও পাঠকৃতি নির্মাণের মাধ্যমে নিজের মধ্যে নিজে ডুব দেন। এর মাধ্যমে দু'জনের মধ্যে একটা সংযোগও তৈরি হয়।

রবীন্দ্রপরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এমন এক কল্প জগৎ সৃষ্টি করেছেন যার নির্দিষ্ট সত্য বলে কিছু নেই তবুও আমরা অসত্য বলে তাকে অস্বীকার করতে পারি না। তাঁর 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯)-র অপুকে লেখক বানিয়ে তুলেছেন সত্য করে। কিন্তু তাকে আমরা ছুঁতে পারি না। আবার অস্বীকারও করতে পারি না। শুধুমাত্র অনুভব করতে পারি। জীবনের রহস্য উন্মোচন করা মানবজীবনের একটা রীতির মতো। সব মানুষই নিজেকে জানতে চায় বুঝতে চায়। সেই জানা বোঝার বোধকে বড় বেশি বাড়িয়ে তোলে উপন্যাস। একটি শিশুর চোখে তিনি পৃথিবীকে দেখতে চেয়েছেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত পৃথিবীর পরে

দাঁড়িয়ে লেখক শিশু সুলভ মন নিয়ে জগৎকে দেখেছেন। প্রতিদিনের জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে লেখক পাঠককে এক অন্য জগতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। পাঠক কতটা যেতে পেরেছে তা লেখকের বিচার্য বিষয় নয়। সেই বিচারে বসলে লেখক আর লিখতে পারতেন না। শত সহস্র পাঠক কীভাবে গ্রহণ করবে তার বিচার করা সম্ভবও নয়। একঘেয়েমি জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের মনে জীবন রহস্য উদঘাটনের সম্ভাবনা তৈরি করে উপন্যাস। সময়-এর সঙ্গে সঙ্গে রহস্যের প্রকৃতির পরিবর্তন হয়। সেই অনুযায়ী উপন্যাসের ধরণও বদলে যেতে থাকে। যে বিভূতিভূষণ 'পথের পাঁচালী' লিখেছেন তিনিই আবার জীবনের শেষ অধ্যায়ে 'ইচ্ছামতী'-র মতো উপন্যাস লিখেছেন। নিজেকে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে খুঁজে পেতে চেয়েছেন। এটা প্রায় সব লেখকের ক্ষেত্রেই কিছুটা সত্য। কারণ জীবনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে নিজেকে জানতে এবং জানতে গিয়ে যত রহস্যের উন্মোচন হয় ততই লেখার ধরণ যায় বদলে। বিষয় পরিবর্তিত হয়। তবে এর কোনও শেষ নেই।

ব্যক্তিস্বাধীনতা, আত্মসচেতনতা এই শব্দগুলি আধুনিককালের। আধুনিক পূর্বযুগে মানুষ প্রশ্ন করতে জানত না। যা পেত তাই নিয়েই শান্ত থাকত। কিন্তু আধুনিক যুগে মানুষ আত্মসচেতন। সে প্রথমে নিজেকে জানতে চায়, তার পরিপার্শ্ব, সমাজ পরিবেশ সবটাই জানতে চায়। আর সেই জানানোর কাজে সহায়ক হয়েছে উপন্যাস। মানুষের ত্রিমাত্রিক রূপকে ভাষা দান করেছে। মানুষের জীবন অনুসন্ধানেরও শেষ নেই। তার উন্মোচনেরও শেষ নেই। তবে পদ্ধতির পরিবর্তন আছে। লেখ্য সাহিত্য হিসাবে যে সব রূপগুলি আমাদের সামনে আছে তার মধ্যে মানুষের মনের কথা উচ্চমানের মানুষের কথা ইত্যাদি আরও বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেয় উপন্যাস। প্রতিদিন মানুষ আধুনিক হয়েছে এবং হচ্ছে। তার চাহিদার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। সেই পরিবর্তনকে সূচিত করে উপন্যাস। তার জন্য উপন্যাসের মধ্যেও পরিবর্তন করতে হয় সেটা সময়ের নিয়মে। কালের সূত্র ধরে। এ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক মত দিয়েছেন,

> ''ব্যক্তিত্বের রহস্য সম্পর্কে মানুষ বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে আধুনিককালে। তার সূত্রপাত রেনেসাঁসের সময় থেকে।

এনলাইটেনমেন্টের পর থেকেই মানুষের আত্মসচেতনতা ও সমাজ চেতনা একসঙ্গে প্রখর হয়ে উঠেছে। ক্রমে মানুষ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জেগেছে। এইসব প্রশ্নের মধ্য দিয়েই মানুষের নানা রকম ঢিলেঢালা কাহিনি দানা বেঁধে উপন্যাসের রূপ নিয়েছে।"[৫]

বিশ্বভাবনা ছেড়ে আধুনিক উপন্যাস ধীরে ধীরে আঞ্চলিক দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। এত বড় বড় বিষয়কে ছেড়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল নিয়ে উপন্যাস লেখার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে। তার প্রতিভূ হিসেবে তারাশঙ্কর-এর নাম উল্লেখ করতে পারি। তিনি মূলত রাঢ় বঙ্গের মানুষ ও তাদের জীবনের কথা নিয়েই লেখা চালিয়ে গেছেন। সেখানকার ভূপ্রকৃতিও রুক্ষ, শুষ্ক পাথুরে। তারাশঙ্কর যে সময়ে উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন সেই সময় সমাজে, রাজনীতিতে, অনেকগুলি দ্বন্দ্ব কাজ করতে শুরু করেছে। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় পালাবদল দেখা দিয়েছে। হিংসা ও অহিংসার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে, স্বাধীনতা আন্দোলন বিভাজনের পথে, ঐতিহ্য আর আধুনিকতার মধ্যে দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। এই সব একাধিক বিষয়ের প্রভাব লেখকের মধ্যেও পড়বে এটাও খুব স্বাভাবিক কারণ লেখক ও সমাজেরই এক জন। তাঁর রচনার মধ্যেও কতকগুলি দ্বন্দ্ব কাজ করেছে বারে বারে বিভিন্ন লেখায়। যেটা বারে বারে চোখে পড়ে তা হল ধ্বংসপ্রাপ্ত জমিদার এবং নতুন ব্যবসাদারের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এছাড়াও চাষের জমি নিয়ে চাষি এবং পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্ব, ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার দ্বন্দ্ব, পরম্পরার সঙ্গে আধুনিকতার দ্বন্দ্ব। তাঁর 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথায়' এ রকম বহু দ্বন্দ্বের কথাই আমরা শুনতে পাই। কাহার সম্প্রদায়ের জীবনে এই দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে তার মধ্যে যে পরিবর্তন তারই চিত্র ভাষারূপ পেয়েছে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' উপন্যাসে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি জনজাতির বসবাস। তারা তাদের আচার সংস্কার, ঐতিহ্য, পরম্পরাকে আঁকড়ে বাঁচতে চায়। সময়কে অস্বীকার করে তারা তাদের নিজস্ব সময় নির্মাণ করে। সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থাকে তারা অস্বীকার করতে চায়। হোমিওপ্যাথি এবং অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োগের ব্যাপারে এই দ্বন্দ্ব চোখে পড়ে। তাদের বিশ্বাস, রীতিনীতি এ সবই উপন্যাস জুড়ে ছড়িয়ে আছে। ভূমি সমস্যার কথাও এই উপন্যাসে ভাষা পেয়েছে। এই সমস্যা

তৎকালীন সময়ের একটা বড় সমস্যা। শিল্পপতিরা ধনপতিরা ব্যবসা করতে জমি চায়। বসবাসকারী মানুষগুলি তাদের ঐতিহ্যকর বাসভূমিকে রক্ষা করতে চায়। পুঁজিপতিদের কাছে ঐতিহ্য যে মূল্যহীন তা বুঝতে পারে না একঘরে বসবাসকারী এই মানুষগুলি। তাদের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারকে লালনপালন করেই বাঁচতে চেয়েছে। বিভূতিভূষণ যখন অপুর চোখে স্বপ্নের পৃথিবীকে দেখছেন প্রায় সেই সময়েই তারাশঙ্কর বাস্তবের কতকগুলি মানুষের কথা তাদের বাঁচা, জীবন যন্ত্রণা, সুখ-দুঃখ, আচার-সংস্কার, রীতিনীতি নিয়ে লিখছেন উপন্যাস। এও তো সময়েরই চাহিদা। একটা জাতির একটা সময়। এতে কি শুধু হাঁসুলি বাঁকের তীরের কাহাররাই ভাষা পায় না, সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এই সম্প্রদায় ভাষা পায়। তারা পরিচিতি পায় মানব সমাজে, শিক্ষিত সমাজে। এছাড়াও তিনি একাধিক লেখা লিখেছেন তা মূলত রাঢ় বঙ্গের এবং বিশেষ করে বীরভূম জেলার মানুষের কথাই বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন মাধ্যমে বলেছেন। এর অবশ্য কারণও ছিল। তিনি ঐ অঞ্চলের বাস্তব মানুষদের বাস্তব চোখে দেখেছেন, বুঝেছেন, জেনেছেন। তাদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে কল্পনা অনেক কমই করতে হয়েছে। বাস্তবের দিকে চোখ ফিরেছে লেখক গোষ্ঠীর। এর পিছনে সাময়িক পত্রের ভূমিকাও অনেকখানি। 'কল্লোল', 'কালি কলম'-এর মতো পত্রিকাগুলি রোমাঞ্চের ধূলি খুলে বাস্তবের চোখ ফিরিয়েছেন।

বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ যে সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্তকে উপন্যাসের ভূমিকায় নিয়ে এসেছিলেন তার পিছনে তাদের ব্যক্তি জীবনের অনেকখানি। এনারা সকলেই ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিবাসী। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সরকারি কর্মচারী, রবীন্দ্রনাথও ভূম্যাধিকারীবংশের। এনারা সকলেই কলকাতাকেন্দ্রিক, সেখানেই জন্মগ্রহণ এবং বেড়ে ওঠা। তাদের চোখে মধ্যবৃত্ত জীবনই বেশি করে প্রতিভাত হয়েছে। নিম্নবর্গ, নিম্নবিত্তের কোনও মানুষ তাদের উপন্যাসে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেননি। পরবর্তী সময়ে লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে পরিসরের পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন জেলা থেকেও লেখক প্রতিষ্ঠা পেতে থাকেন। বিভূতিভূষণ গ্রামের দরিদ্র বংশের চরিত্র তুলে এনেছেন। তবে সেখানে দরিদ্রের বীভৎস রূপ নেই, যা আছে তা হল শান্ত, স্নিগ্ধ দরিদ্র, তার বিরুদ্ধে সেভাবে প্রতিবাদী স্বর নেই। এটা যেন পূর্ব নির্দিষ্ট, এটাই যেন নিয়তি নির্দিষ্ট।

আবার সতীনাথ ভাদুড়ি বিহারের জনগণের জীবনচিত্র উপন্যাসে, ভাষা দিয়েছেন। তাদের মুখে ভাষা দান করেছেন। 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। তিনি বিহারের জনগণকে কাছ থেকে জেনেছেন। তাদের দুঃখ-কষ্ট, তাদের জীবন কথা শুনেছেন অনুভব করেছেন। সরাসরি পার্টির কর্মী হওয়ার সুবাদে এইসব বিষয়গুলি তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী যে সময় তাকেও উপন্যাসে ধরার চেষ্টা করেছেন। এতদিনের ঔপনিবেশিক ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা এনাদের লেখার মধ্যে ভাষারূপ পেয়েছে। উনিশ শতকের উপন্যাসে এই ভাবনা ভাবতেই পারতেন না। বিশ শতকে এসে ধীরে ধীরে সেই বাধাধরা গণ্ডী ছাড়িয়ে সমাজের অপর জনগোষ্ঠী যারা সংখ্যায় বিপুল বিশাল তারাও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। এতদিন যাদের কথা কেউ জানতই না, জানবার চেষ্টাও করেনি তারাও মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাদের মুখেও ভাষা এসেছে। ঔপনিবেশিক ভাবনায় আমরা এদের কথা ভুলতেই বসেছিলাম। অথচ এরাই আমাদের আদি। সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, নীপিড়িত শোষিত জাতি হিসাবে সমাজেরই এককোণে গ্রামের এক ধারে পাড়ায় একঘরে হয়ে বসবাস করছিল। তাদের মুখে ভাষা দেবার জন্য বিশ শতকের কিছু লেখক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এতদিনের বন্ধনকে ছিন্ন করে সাহসের সঙ্গে অপর জাতিকে সমাজের শিক্ষিত মানুষের ভাবনায় প্রবেশ করিয়েছেন। এই অপরের মধ্যে অবশ্য নারীরাও পড়েন। কারণ তারাও এতদিন ভাষাহীনই ছিলেন। সমাজের গণ্যমান্য পুরুষের ভাষাই তাদের ভাষা। নিজস্ব চেতনার বিকাশ বিশ শতকেই বিস্তৃতভাবে আলোচনায় প্রবেশ করেছে। বয়ানে তারাও প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রকাশ করেছে। খেলার পুতুল থেকে মানুষের দিকে অগ্রসর হয়েছে। তবে স্থিতাবস্থায় এখনও পৌঁছয়নি। এর দিকেই যাত্রা, যাত্রাই তো জীবন, চলতে থাকাই জীবন। এভাবেই সময়ের হাত ধরে সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবনের পরিবর্তন হয়। সেই পরিবর্তিত জীবনই স্থান পায় লেখায়, আমরা যাকে উপন্যাস নামে চিহ্নিত করেছি।

রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব শরৎচন্দ্র। তিনি বাংলা সাহিত্যে নারীকে এক অন্য আঙ্গিকে নিয়ে এসেছিলেন। নারীমনকে সর্বসমক্ষে নিয়ে এসেছিলেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা অখণ্ড বাংলাদেশে এবং বাঙালি

সামাজে এক ক্লান্তিকর পরিস্থিতির সূচনা করেছিলেন। ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরে ভয়াবহ বন্যা এবং দেশীয় প্রেক্ষিতে আগষ্ট আন্দোলন, পরের বছরই মন্বন্তর, ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ দাঙ্গা, এরপরই দেশভাগ, বাংলা ভাগ, স্বাধীনতা এবং একই সময়ে গৃহহীন মানুষের স্রোত বাংলাকে, বাঙালি জাতিকে একটা সংকট মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। পূর্বের শান্তি প্রশান্তির জীবনে আর আমরা ফিরতে পারিনি। সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়েছে। বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী, বনফুল, সতীনাথ ভাদুড়িদের মতো সমকালীন লেখকগণ বাংলা উপন্যাসে প্রশান্তির, মায়ার পরিবর্তে বাস্তবের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তারাশঙ্কর, সতীনাথ ভাদুড়ি তো সরাসরি কংগ্রেস দলের সদস্যকর্মীও ছিলেন। তারাশঙ্কর যেমন বীরভূমের জনগণকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তেমনই সতীনাথ ভাদুড়ি, বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বিহারের জনগণকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, জেনেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ি তাঁর 'ঢোঁড়াইচরিত মানস'-এ বিহারের গ্রাম, সেখানকার মানুষ, তাদের জীবনকে সাহিত্যে রূপদান করেছেন। বনফুল তাঁর 'শতিকয়া' উপন্যাসে বিহারের মানুষকে ভাষারূপ দিয়েছেন।

সমসাময়িক আরও একজন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও একটি রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থন ছিলেন। বাংলা সাহিত্যকে তিনি সমাজের নিম্নস্তরে নামিয়ে এনেছেন। নিম্নবৃত্তীয় মানুষের কথাকে তাঁর লেখার মধ্যে স্থান দিয়েছেন। বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় তাঁর রচনায় পাওয়া যায়। এর পিছনে লেখকের ব্যক্তি জীবনও জড়িয়ে আছে। বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সুবাদে বিজ্ঞান মনস্কতাও তাঁর লেখায় খুব স্বাভাবিকভাবেই চলে এসেছে। সাহিত্যিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই জানিয়েছেন,

> ''নিজস্ব একটা জীবন দর্শন ছাড়া সাহিত্যিক হওয়া সম্ভবন নয়। এইজন্য তাঁর শুধু বসে বসে লেখার বা প্রুফ সংশোধন করার শ্রম নয়— সবসময় সর্বত্র জীবনকে দর্শন করার বিরামহীন শ্রমও তাঁকে চালাতে হবে।''[৬]

লেখার মধ্যে লেখকের জীবনদর্শন প্রকাশ পাবেই, এটা খুব সাধারণ বিষয়। সর্বত্র জীবনকে দর্শন করার কথাও বলেছেন। অর্থাৎ শুধুমাত্র শিক্ষিত, মার্জিত, শহুরে মধ্যবৃত্তের জীবনই নয়, তা ছাড়াও যে বিরাট অংশের জনগণ আছে তাদের জীবন ও সাহিত্যের বিষয় হয়ে

ওঠার রসদ রয়েছে, শুধু লেখককে তাদের জানতে হবে বুঝতে হবে এবং লেখকের জীবনদর্শন অনুযায়ী তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। সাহিত্য সর্ব স্তরের মানুষের বিষয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সেসসব মানুষের জীবন, বারে বারে ভাষা পেয়েছে। তাঁর 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসে মানুষকে পুতুলসম রূপ দিয়েছেন। তাদের জীবন যেন কোনও এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা। তাদের নিজস্ব কোনও জীবন নেই। অদৃশ্য শক্তির ইচ্ছাতেই যেন তাদের জীবনের ওঠা-পড়া। সব মানুষই নিজের একটা জগৎ নির্মাণ করে বাঁচতে চায়। তবে কতজন তার সার্থক আনন্দ লাভ করতে পারে, যারা পারে তাদের জীবন আর যারা পারে না তাদের জীবন দুই সাহিত্যে স্থান পায়। এর পরের বিষয় পাঠকের বিচার্য। পদ্মার তীরে মাঝি সম্প্রদায়ের জীবন, তাদের প্রেম, ভালোবাসা, বাঁচা-মরা, পারিবারিক সম্পর্ক, শারীরিক সম্পর্ক ইত্যাদি একাধিক বিষয়ের খুঁটিনাটি 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে আমরা পাই। মার্কসীয় ভাবনায় ভাবিত হওয়ার কারণে লেখক বারে বারে ফিরে গেছেন সমাজের নীচু তলার কাছে। তাদের জীবনকথাকে বিস্তৃতভাবে উপন্যাসে বা গল্পে অর্থাৎ সাহিত্য প্রকরণের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তী একটি উপন্যাস নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল'। লেখককে এখানে কলকাতার মধ্যবৃত্ত জীবনের ছবি আঁকতে দেখি। তবে সে ছবি শিল্পী নয়, ক্যামেরাম্যানের ছবি। তিনি চর্মচক্ষুতে যা দেখেছেন তাই ভাষায় প্রকাশ করেছেন। একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, তাদের প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, ঝগড়া, অশান্তি ইত্যাদি একাধিক বাস্তব ছবি এঁকেছেন। এটাও একটা সাহিত্যের ধরন। কল্পনাকে প্রায় বর্জন করে বাস্তবের বিষয়ে শুধুমাত্র লেখনীগুণে অপরিচিত করে পাঠকের সামনে হাজির করা। চেনামহল সবারই চেনা কিন্তু আমরা যখন পাঠ করি তখন এই চেনা জগৎই বারে বারে অচেনা হয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। মনে হয়, চেনা কিন্তু ঠিক স্মৃতিগোচর হয় না। একটা ছায়া, একটা মায়া আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে।

মানুষের মানসিকতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হতে থাকে, মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের নিয়মনীতি তাকে মেনে চলতেই হয়। সমাজের পরিবর্তনও তাই মানুষের মধ্যে অনায়াসে ঢুকে যায়। তার জন্য পৃথক কোনও অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। আর সেই মানুষের কথাই যখন লেখক লেখেন, তার পরিবর্তনটাও অনায়াসে পাঠকৃতির মধ্যে চলে

আসে। লেখকও সমাজের বাইরে নয়, বা অন্যগ্রহের জীবনও নয়। তিনিও একটা সমাজ পরিবেশে লালিত-পালিত হন। তাই সমাজের পরিবর্তনের প্রভাব তাঁর ওপরও পড়ে। সেই পরিবর্তিত মানসিকতা তাঁর লেখার মধ্যেও প্রকাশ পায়। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৌকাডুবি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। বিশ শতকের প্রথম দশক, ঔপনিবেশিক শাসন মধ্যগগনে। লেখক বড় হয়েছেন উচ্চবৃত্ত পরিবারে। মূলত কলকাতাকেন্দ্রিক জীবন। তাঁর এই উপন্যাসের দুটি প্রধান চরিত্র হেমমালিনী এবং রমেশ। তাদের মধ্যেকার বিশ্বাসের যে বাতাবরণ লেখক তৈরি করেছেন তা কয়েক মুহূর্তেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। হেমমালিনী তা অনায়াসে মেনে নিয়েছে, রমেশও বিন্দুমাত্র সংশয় প্রকাশ করেনি। অর্থাৎ তৎকালীন বিশ্বাসের যে আবহ ছিল তার ঠিক ষাট বছর পর প্রকাশিত বিমল করের 'পূর্ণ অপূর্ণ' (১৯৬৭) উপন্যাসের দুটি প্রধান চরিত্র অবনী এবং হৈমন্তী। তারা কিন্তু সেভাবে ভাবতে পারেনি। এত সহজে, এক মুহূর্তে তাদের মধ্যে বিশ্বাস বা প্রেম যা-ই বলি না কেন, কিছুই জাগ্রত হয়নি। ভালোলাগাটা তাদের কাছে মুহূর্তের সম্মোহনমাত্র। আগে না পাওয়া জীবনের একটা অন্য মুহূর্ত। একটা অনিশ্চয়তার আবহ তাদের মধ্যে কাজ করেছে। ভবিষ্যতের কোনও স্থিতরা তারা মানসিকভাবে দেখানে পারেননি। অর্থাৎ প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে যে নায়ক-নায়িকারা সহজেই একে অপরকে বিশ্বাস করতে পেরেছিল, অর্ধশতাব্দীকাল পরের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে সেই বিশ্বাস আর নেই। তারা অনেক বেশি যুক্তি প্রবণ হয়ে পড়েছে। সময়ের জাঁতাকলে, পরিস্থিতির চাপে তাদের মধ্যে এই পরিবর্তন খুব স্বাভাবিকভাবেই চলে এসেছে।

সাহিত্য সময় একদিনে বদলে যায় না। বহু বছর ধরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে পরিবর্তন সূচিত হয়। তাই কোনও সাল, তারিখ ধরে পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা যায় না। একটা বিস্তৃত সময়ব্যাপী চলতে থাকে এই পরিবর্তনের ধারা। পরিবর্তনের সূচনা প্রথম হয় মানুষের মধ্যে তা আস্তে আস্তে বয়ে চলে। মানুষই পরিবর্তন বয়ে নিয়ে চলে সমাজ, পরিবেশ, রাজনীতি, অর্থনীতির পরিবর্তনের চিহ্ন বয়ে নিয়ে চলে। অন্যদিকে উপন্যাসের অন্বিষ্টও মানুষ। মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবন আলেখ্যই প্রকাশিত হয় উপন্যাসে। মানুষ ব্যতীত উপন্যাস রচনা হতে পারে না। মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন উপন্যাসেও পরিবর্তন সূচিত করে।

সময়ের সঙ্গে মানুষের জীবনে জটিলতার পরিমাণ বাড়তে থাকে। উপন্যাস বয়ানে সেই জটিলতাই পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। এখানে লেখকের রচনা রীতিরও একটা প্রভাব আছে। বাস্তব জটিলতা আর উপন্যাসের জটিলতার মধ্যে বিস্তর ফারাক। উপন্যাসের নির্যাস সম্পর্কে অসীম রায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য,

> ''উপন্যাসের যে গড়ন ধাপে ধাপে অনেক মানুষের জীবনের মধ্য দিয়ে অনেক সময় নিয়ে গড়িয়ে যায়, যার মধ্যে বছরের পর বছর ডুবে থাকা যায়। সেই বিশেষ গড়ন আমার কালের চেহারা ধরবার পক্ষে সবচেয়ে সার্থক মনে হতে থাকে। কারণ সমাজ ও আত্মজিজ্ঞাসার এমন প্রবল সময় আগে কখনও আসেনি। আমি এ ক্ষেত্রে খুনোখুনি, হানাহানি ও অজস্র রক্তক্ষয়ের কথাই বলছি না, আমি বলছি স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের সমগ্র পরিবর্তনের চেহারার কথা, মানুষের মেজাজ পাল্টানোর কথা, যদি কোনও লেখক যথেষ্ট ধৈর্য ও আত্ম অনুশীলনের দ্বারা আমাদের কালের চেহারা বোঝবার চেষ্টা করেন তা হলে বাংলা উপন্যাসের দ্বিতীয় জন্ম খুবই সম্ভব।''[৭]

তিনি এ কথা বলেছেন বিশ শতকের সত্তরের দশকে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সমাজে, রাষ্ট্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করেছেন তাকেই উপন্যাসে বিষয় করার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে আশাবাদী সমসাময়িক কালের লেখকরা এ ব্যাপারে উৎসুক হবেন এবং উপন্যাসের নতুন ধরন আমরা লাভ করতে পারব। মনুষ্য জীবনকে দেখা এবং দেখানোই উপন্যাস লেখকের প্রধান কাজ। যদি লেখকেরা দেখার ব্যাপারে সচেতন হন তা হলে অবশ্যই দেখানোর কাজে অর্থাৎ প্রকাশ ভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটবে। প্রত্যেক লেখকের একটা নিজস্ব জীবন দর্শন থাকে। সেই অনুযায়ী তিনি দেখেন এবং দেখানোর চেষ্টা চালিয়ে যান।

''সময়ের দায় ঔপন্যাসিককে মানতে হয়। সময়ের পাককেও ঔপন্যাসিক এড়াতে চান। কারণ তিনি পৌঁছতে চান ব্যক্তিমানুষের কাছে। সেই ব্যক্তিমানুষ সময়ে অন্বিত, হয়তো বা সময়ের পাকচক্রে বাঁধা। তার কাছে পৌঁছতে ঔপন্যাসিককে হাজার পথ খুঁড়তে হয়।''[৮] ব্যক্তি

মানুকে খুঁজতে গিয়ে সময় স্বাভাবিক নিয়মে লেখার মধ্যে ঢুকে পড়ে। একজন লেখক সময়ে ভিন্নতায় ভিন্ন ধরনের বয়ান উপস্থাপন করেন। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অসহযোগের পথে। তখন গান্ধীজি তাঁর রাজনৈতিক কার্যকারণ চালিয়ে যাচ্ছেন। তখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'পুতুল নাচের ইতিকথা' আবার এরই সঙ্গে সঙ্গে লিখেছেন 'পদ্মানদীর মাঝি' যেখানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ছায়া। ময়নাদ্বীপের প্রসঙ্গ যার উদাহরণ হিসেবে সাহস জোগায়। নতুন সমাজ গঠনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এগুলি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী। তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাটে মূলত মানুকেই খুঁজতে চেয়েছেন লেখক। আবার স্বাধীনতার অনতিকাল পরেই লিখেছেন 'অহিংসা' নাম দিয়ে, তখন আর অসহযোগ বা সমাজতন্ত্রের বিষয় নেই। গান্ধীজিও ততদিনে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক। অসহযোগ বা অহিংসার বদলে তখন মানুষের মনে হিংসাই বিরাজ করেছে। তাই শুধু সময় দিয়ে যেমন বয়ান রচনা হয় না ঠিক উল্টোদিকে বলতে পরি সময়কে অস্বীকার করেও সাহিত্য রচনা হতে পারে না।

বিশ শতকের ঘটনাপ্রবাহ বাংলা সাহিত্য জগৎকেও প্রভাবিত করেছে। স্বাধীনতা এবং দেশভাগের ঘটনা দেশের মানুষের মনে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতার আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই দেশ ভাগের বিচ্ছেদ জনগণের মনে বিষাদের হাওয়া বয়ে নিয়ে এসেছে। একটা দেশ দু'টুকরো হয়েছে। সমাজ পরিবেশও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সামাজিক বন্ধন ভেঙে পড়েছে। কিন্তু তা সরাসরি কতটা ভাষা পেয়েছে। তবে একেবারেই যে কিছু লেখা হয়নি তা নয়। তবে ঘটনার এই ঘনঘটার রেশ কাটতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেছে। ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে তখনও আমরা বেরোতে পারিনি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের যে মন, তাদের চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যে প্রকট হয়নি। স্বাধীনতার স্বাদ আমাদের প্রত্যন্ত গ্রামে কতটা পৌঁছেছে, তারা সেই ঘটনায় কতটা আনন্দিত, দুঃখিত, তারা কী চায়, তার কোনও পরিচয় আমরা পাই না। মূলত মধ্যবৃত্ত জীবন, তাদের চাওয়া পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাঁচা-মরা, ভালো-মন্দ নিয়েই সাহিত্য রচিত হয়েছে। তবে ততদিনে কল্পনার বিস্তৃত বিবরণ ত্যাগ করে আমরা অনেকটাই বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়েছি। সমসাময়িক রাজনৈতিক,

সামাজিক বিষয় নিয়ে কিছু লেখালেখি শুরু হয়েছে। তবে পুরোপুরি পুরনো ফর্মকে অস্বীকার করতে পারিনি। এর পেছনে অবশ্য প্রায় দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসক অনেকটাই দায়ী। আমাদের মনে লালিত-পালিত এত দিনের সংস্কার এত কম সময়ে ফিকে হয়ে যাবে, এটাও কষ্ট-কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাহিত্য প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হল ভাষা। সে কথ্য বা লেখ্য যে কোনও সাহিত্য প্রকরণের ক্ষেত্রেই সত্য। আমাদের আলোচনার বিষয় লেখ্য সাহিত্য। লেখকরা সাহিত্য লেখেন ভাষার সাহায্যে। তা যে কোনও ভাষার ক্ষেত্রেই হোক না কেন। আমাদের প্রতিদিনের একটা ব্যবহারিক ভাষা আছে। আমরা কথা বলি, আলাপ-আলোচনা করি। কিন্তু সাহিত্য ব্যবহারিক ভাষায় খুব একটা রচিত হয় না। লেখক তাঁর বিষয়ের প্রয়োজন অনুসারে, সময়কে মান্যতা দিয়ে একটা ভাষা শিল্প নির্মাণ করে নেন। সেই ভাষাতেই সাহিত্য কর্ম চালিয়ে যান। উপন্যাস শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত একটি নবীন শিল্প। তার আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। তার আগেও কিছু প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, যেমন 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম পেঁচার নকশা', 'নববাবু বিলাশ', 'নববিবি বিলাশ' ইত্যাদি। সেখানে মূলত শহুরে বাঙালি, জীবন অভিজ্ঞতার কথাই বর্ণিত হয়েছে। এখানে 'অভিজ্ঞতা' শব্দটি ব্যবহার করেছি তারও কারণ আছে। যারা এগুলি লিখেছেন তারা কলকাতার অধিবাসী এবং তৎকালীন শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাকেই বয়ান আকারে প্রকাশ করেছেন। বিষয় অতীব ঘরোয়া এবং সেই সময় সাহিত্যের নির্দিষ্ট ভাষার কথা তখন বাঙালি লেখকরা অন্তত গ্রহণ করেননি। তাই সেখানে সাধুভাষারই ঐতিহ্য লক্ষ করা যায়। কারণ তখন সাহিত্য মার্জিত ভাবগম্ভীর সংস্কৃত প্রবণতা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারে না। পরবর্তীতে বঙ্কিমের হাত ধরে পাশ্চাত্যে নভেল-এর অনুসরণে আমরা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের রূপ পেয়েছি 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে। তা ইতিহাস সমৃদ্ধ কাহিনি। লেখকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও অভিজ্ঞতাই ঘটনা বিষয়ে ছিল বলে মনে হয় না। যা ছিল তা হল অসম্ভব কল্পনা। তাই তার ভাষা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। সাধু ভাষাতেই রচিত হয়েছে ঐতিহাসিক বয়ানটি তবে পড়তে গিয়ে মনে হয় আমরা বোধহয় সংস্কৃত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাই পড়ছি। তবে তা আমাদের

দৈনন্দিনের ভাষা নয়, তা শুধুমাত্র সাহিত্যেরই ভাষা হয়ে রয়ে গেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী হিসেবে যার নাম সর্বাগ্রে আসে তিনি রবীন্দ্রনাথ। প্রায় দুই দশক ধরে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষারই অনুবর্তী হয়েছে। অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনী থেকে সন্ধ্যাসঙ্গীত পর্যন্ত তাঁরা একই ভাষারীতির অনুসারী হয়েছে। সেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার তুলনায় কাল্পনিক অভিজ্ঞতার ওপরই জোর দিয়েছেন। ''এই দুই পথিকৃৎ তাঁদের রচনায় অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষতার ওপর নির্ভর করেননি, নির্ভর করেছেন কল্পনার প্রত্যক্ষতার ওপর। আয়েষা পাঠানকন্যা হয়েও সংস্কৃত প্রধান বাক্যে কথা বলেন। ও জগৎ সিংহ তাঁর ভাষায় কোনও প্রাদেশিক প্রমাণিকতার ধার ধারেন না।''[৯] পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেট গল্পে এই ধারার পরিবর্তন করতে চেয়েছেন। তিনি রাজপথ থেকে নেমে গলিপথে গেছেন কিন্তু ভাষায় তেমন কোনও পরিবর্তন সাধন করতে পারেননি। রবীন্দ্রপরবর্তী সাহিত্যিক ত্রয়ী বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পরিচিত গ্রামে পৌঁছেছেন, সেখানকার মানুষের ছবি তুলে এনেছেন, যেমন 'পথের পাঁচালী', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'পুতুল নাচের ইতিকথা' বা 'পদ্মানদীর মাঝি', তবে সেখানেও কতটা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ আর কতটা কল্পনা সমৃদ্ধ তা আমাদের মনে সন্দেহের অবকাশ রেখেই যায়। অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণের ভাষা আমরা সেভাবে পাই না তবে রবীন্দ্র শিল্প থেকে ভাষাকে অনেকটাস সরিয়ে এনেছেন। তাদের লেখকেরা অনেকেই এগিয়েছেন নতুন ঘরানা সৃষ্টিতে তবে কতটা সফল তা আমরা বলতে পারি না কারণ তা আমাদের মনে সেভাবে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। সতীনাথ ভাদুড়ি তাঁর 'ঢেঁড়াইচরিতমানস' রচনায় বিহারের পটভূমিকে বেছেছেন। তিনি নিজেই কোথাও কোথাও স্বীকার করেছেন। তিনি বিহারের পূর্ণিয়া জেয়ার গ্রামেও শহরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাদেরকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাতমাটুলির বাস্তব ঢেঁড়াইকেই উপন্যাসের ঢেঁড়াই-এ রূপ দিয়েছেন। তাকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংযুক্ত করে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে লেখিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি বরাবরই একটা নিজস্ব, ঘরানা তৈরি করেছেন। মূলত নিম্নবর্গীয় চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতেই তার কলম বারে বারে জাগ্রত হয়েছে। বিশ শতকের সত্তরের দশকে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'আঁধারমানিক'।

নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তাঁর এই রচনা। 'অপারেশন বসাই টুডু', 'অরণ্যের অধিকার' ইত্যাদি বিখ্যাত রচনাগুলি সবই নিম্নবর্গের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সমাজ বঞ্চিত, অপর জনজাতি, আদিবাসী নামে পরিচিত মানুষগুলির জীবন তুলে এনেছেন। তাদের মুখে প্রতিবাদের ভাষাও দিয়েছেন। তাঁর 'মাস্টার স্যার' উপন্যাসের একটি চরিত্র ভক্তলাল সে তার দুশমনকে বাস্তবে খুন করতে পারেনি কিন্তু মনে মনে দশবার খুন করেছে যা এর আগের কোনও ভক্তলালই করতে পারেননি। তারা ভাবতেই পারেনি সমাজের উঁচুতলার মানুষকে খুনের কথা। নিম্নবর্গকে তিনি নির্যাস করেছেন এবং ভাষা জুগিয়েছেন। এর পূর্বে নিম্নবর্গের নির্মাণ অনেকেই করেছেন কিন্তু কেউই সেভাবে কথা বলতে পারেননি। বিশ শতকে সত্তরের দশকে ঘটে যাওয়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রামও তার উপন্যাসে ভাষা পেয়েছে। সেখানে শুধুমাত্র গল্প বলেই ক্ষান্ত থাকেননি। তাঁরা উপন্যাসের চরিত্ররা বারে বারে আত্ম-অন্বেষণের গভীরে ডুব দিয়েছেন যা সময়কে বড় বেশি করে সূচিত করেছে।

বিশ শতকের আশির দশকে বাংলা সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 'সাবঅলর্টান স্টাডিজ'-এর প্রথম প্রকাশ। ১৯৮২ সাল নাগাদ সাহিত্য ক্ষেত্রে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে। নিম্নবর্গের চেতনা বাংলা সাহিত্যে পাকাপাকি স্থান গ্রহণ করেছে। মধ্যবিত্তকে ছেড়ে সাহিত্য নিম্নবিত্তের দিকে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছে। তবে সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ-এর সংকলন বেরোবার পরই নিম্নবর্গীয় চেতনা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে এমনটা নয়। এর বহু পূর্বেই নিম্নবর্গীয় চেতনা লেখার মধ্যে স্থান পেতে শুরু করেছে। সত্তরের দশকে নিম্নবর্গীয় চেতনা সমৃদ্ধ লেখা 'মাস্টার স্যার' মহাশ্বেতা দেবীর একটি পথ নির্দেশ। আর তত্ত্ব পড়ে তো সাহিত্য রচনা হয় না। সাহিত্য রচনার পর তারই সাধারণীকরণ করে সাহিত্য তত্ত্ব নির্মিত হয়। তত্ত্ব পাঠ করেও লেখকরা লিখতে বসেন না। লেখকের একটা দেখার চোখ থাকে। তিনি তাঁর নিজস্ব ফোকালাইজেশনে কোনও ঘটনাকে দেখেন।তারপর সেই ঘটনার আত্তীকরণ করেন। নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তার সঙ্গে যুক্ত করেন। নিজের দর্শন অনুযায়ী তাকে নির্মাণ করেন এবং তারপরই শিল্পের প্রকারে প্রকাশ করেন। সেটা যে কোনও শিল্প প্রকরণই হতে পারে। তবে আমরা মূলত উপন্যাস নিয়েই আলোচনা করেছি। এটি মূলত বিবরণ ধর্মী একটি লেখ্য শিল্প প্রকরণ। লেখক

একটি ঘটনা বা কাহিনি গ্রহণ করেন তাঁর বিবরণ, তাঁর বক্তব্য, তাঁর দর্শনকে পাঠকের সামনে হাজির করেন। পাঠক সেই বয়ান পাঠ করে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে। কেউ কাহিনির আনন্দ লাভ করে। কোনও কোনও পাঠক বিবরণ থেকে লেখাকে খুঁজতে থাকেন। কেউ কেউ আবার কাহিনি এবং বিবরণের মধ্যে মিলিয়ে মিশিয়ে অন্য একটা জগৎ তৈরি করেন।

বিশ শতকের আশির দশকে প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস প্রফুল্ল রায়ের 'আকাশের নীচে মানুষ'। লেখক একটি ঘটনা বা কাহিনির আশ্রয় দিয়েছেন। কাহিনির একটি নির্দিষ্ট পরিসরও নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। একদিকে রাঁচী পাটনা হাইওয়ে, অন্যদিকে ছোটনাগপুর মালভূমি। তার মাঝখানে একটি মৌজা গারুদিয়া, মৌজা শব্দটি সাধারণত ভূমির পরিমাপ করতে ব্যবহার করে থাকি, লেখকও তাই করেছেন। সেখানকার একদল ভূমিদাস আর এক দল ভূমির মালিক। মূলত ভূমির অধিকার কার তার একটা দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। কতকগুলি মানুষ তাদের জীবন অতিবাহিত করেছে সামন্ততান্ত্রিক আবহে গণতন্ত্রের আশা বুকে নিয়ে। আর একদল মানুষ যারা এতদিন সামন্ততন্ত্রের প্রতিভূ হিসেবে জীবন-জীবিকা অতিবাহিত করে এসেছে, গণতান্ত্রিক আবহে তারাই আবার ক্ষমতার চূড়ায় অধিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখছে।

উপন্যাসের আরম্ভ হয়েছে কাব্যিক ভাবনা নিয়ে। রৌদ্রের প্রখরতা আস্তে আস্তে ম্লান হয়ে আসছে। লেখক নিম্নবর্গকে সুনিপুণভাবে নির্মাণ করেছেন এই উপন্যাসে। মানব জগৎ থেকে অনেক দূরে একটি বসতি তার নাম দুষাদটোলা। সেখানে মানুষের রীতিতে জন্ম হয় মানুষের কিন্তু তারা পরিণত হয়, চিহ্নিত হয় ভূমিদাস হিসেবে। স্বাধীনতা সমসাময়িক ভূমি সমস্যা এখানে কিছুটা হলেও রূপ পেয়েছে। মানুষগুলি বসবাস করে পশুর নিয়মে। এটা অবশ্য চলতি কথা। পশুরা বাঁচে প্রকৃতির নিয়মে। সেখানে অনিয়ম খুব একটা নজরে পড়ে না। মূলত জৈবিক প্রবৃত্তি নিয়েই তারা বাঁচে। মানুষ শুধু জৈবিক প্রবৃত্তি নিয়ে বাঁচতে পারে না। তাদের মধ্যে প্রেম আছে, ভালোবাসা আছে, বাঁচার তাগিদ আছে। কিন্তু অন্য একদল মানুষ নিজেদের ক্ষমতা কায়েম রাখতে তারা অন্য একদল মানুষকে বাধ্য করে মাথা নামিয়ে বাঁচতে। এখানে দুটি শ্রেণি মূলত প্রকট হয়েছে। একটি শ্রেণি জমির মালিক, জমিদার, তারা উচ্চবর্ণের মানুষ,

রাজপুত, ক্ষত্রিয় বংশজাত রঘুনাথ সিং। তারই জমিতে কাজ করে একদল ভূমিদাস। সংখ্যায় তারা বহু হয়েও তারা কোনওভাবেই সংঘবদ্ধ হতে পারে না। এখানেও আমরা ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত। গুটিকয়েক বিদেশি যে পদ্ধতি অবলম্বনে গোটা একটা দেশের মানুষকে অধীনস্ত করে ফেলেছে। আমরা প্রায় দুশো বছর পরাধীনতার যন্ত্রণা ভোগ করেছি। এখানেও প্রায় একই নিয়মে গারুদিয়া মৌজার গুটিয়েক মানুষ একদল মানুষকে তাদের পায়ের তলায় দাবিয়ে রেখেছে। তারা বাঁচে জমিদারের ইচ্ছায়, মরেও জমিদারের ইচ্ছায়। স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। তারাও মানুষ, তাদের জন্ম হয়, বড় হয়, যুবক-যুবতী হয়, মানবিক নিয়মে প্রেম-ভালোবাসা হয় কিন্তু তারা কোনও পরিণতির দিকে যেতে পারে না। তাদের একমাত্র পরিচয় ভূমিদাস নিয়েই বেঁচে থাকে। লেখক যে সময়ের কথা বলছেন তার বহু পূর্বেই ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয়েছে। যান্ত্রিক সভ্যতা পুরোপুরি শুরু হয়ে গেছে। নতুন নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠার কথাও আমরা উপন্যাসেই পাই। পাশাপাশি ক্ষেতের মধ্যেও বিপরীত চিত্র দেখতে পাই। একদিকে কলের লাঙল, আর তার ঠিক পাশেই চলে একজোড়া বলদ এবং একজন মানুষ, না তারা ঠিক মানুষ না ভূমিদাস। বলদের জীবনের সঙ্গে তাদের জীবনের বিশেষ কিছু ফারাকও দেখা যায় না। সারাদিন পরিশ্রমের পর তারাও খেতে পায়, ভূমিদাসেরাও খাবার পায়। রাত্রে বিশ্রামের পর আবার সেই কাজ। তারা মানুষের মতো করে বাঁচতে পারে না। তারা জানেও না তারা মানুষ। লেখক এই নিম্নবর্গকে নির্মাণ করেছেন ভূমিদাসের আঙ্গিকে। এর পূর্বেও নিম্নবর্গ নিয়ে অনেক বয়ানই আমরা পাই। কিন্তু সামন্ততন্ত্র এবং গণতন্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গ যে একই অবস্থানে রয়ে গেছে তারও একটা চিত্র লেখক ভাষা দিয়েছেন।

'আকাশের নীচে মানুষ' উপন্যাসে লেখক উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর অত্যাচারের কাহিনি বয়ন করেছেন। তবে কোনও বয়ানই শেষ কথা বলে না। সময় অনুযায়ী বয়ান রচিত হয়। সময়ের পরিবর্তনে বয়ানের পরিবর্তন হয়। পরিবর্তিত হয় লেখকের মানসিকতা। বিশ শতকের আশির দশকে লেখক যেখানে বর্ণ বিদ্বেষের অত্যাচারের আখ্যান রচনা করেছেন এর ঠিক এক দশক পর এই লেখকই তার প্রতিবাদের বয়ান রচনা করেছেন,

যার নামকরণ করেছেন 'যুদ্ধযাত্রা (১৯৯১)'। 'আকাশের নীচে মানুষ' উপন্যাস জুড়ে শুধু অত্যাচার, শোষণ, উচ্চবর্ণ মানুষ কর্তৃক নিম্নবর্ণের মানুষদের সম্ভোগ-এর চিত্র। উপন্যাসের একেবারে শেষে লেখক যেন জোর করে ধর্মাকে প্রতিবাদী করে তুলেছেন। তবে সে প্রতিবাদেও তেমন জোর নেই। বাপ-পিতামহের করে যাওয়া ধানের টাকা শোধ করতে গিয়ে ধর্ম্মা জানতে পারে দু-হাজার টাকার ধান পাঁচ হাজার টাকায় পরিণত হয়েছে। তখনও তার মুখে কোনও প্রতিবাদ, মনে কোনও আগুন জ্বালাতে পারেনি। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার, রঘুনাথ সিং ভোটে জেতার পর যখন বলেছে, আমি তোদেরই লোক তখন ধর্ম্মা মৃদু প্রতিবাদ করেছে। সে চেঁচিয়ে বলে উঠেছে, 'ঝুট ঝুট ঝুট। তু হামনিকো আদ্‌মি নেহি'। এটি উপন্যাসের একেবারে শেষ লাইন। লেখক যেন হঠাৎই প্রতিবাদী হয়েছেন। কিন্তু যখন একদশক পরে আমরা 'যুদ্ধযাত্রা' পাই তখন বুঝতে পারি 'আকাশের নীচে মানুষ' যুদ্ধযাত্রার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব বয়ান হিসেবে উঠে আসে 'আকাশের নীচে মানুষ' আবার উল্টোদিকে 'আকাশের নীচে মানুষ'-এর পরবর্তী বয়ান হিসেবে উঠে আসে 'যুদ্ধযাত্রা' উপন্যাসটি।

বিশ শতকের আশির দশকেই গৌরকিশোর ঘোষ রচনা করেন 'প্রেমকেই' নামের উপন্যাস। মুসলমান জীবনের আখ্যান হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসটি। হিন্দু-মুসলমান বিভেদ বহুযুগ ধরে আমরা বয়ে চলেছি। তাতে আরও ঘৃতাহুতি দিয়েছে ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে। কিন্তু এখানে লেখক এত বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে যাননি। মুসলিম গ্রামীণ জীবন, তাদের অন্তঃপুর, নারী-পুরুষ-এর চিত্র চিত্রিত করেছেন। এখানেও সামন্ততন্ত্রের ছবি দেখতে পাই, ভূমি সমস্যার কথা জানতে পারি। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের কথাও আলোচিত হয়েছে। বাংলার চাষি সম্প্রদায়ের লোকের কাছে বাঁচাটাই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। এখানেও সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার প্রকট হয়েছে। তবে অত্যাচার সব মানুষকেই সহ্য করতে হয়েছে। তখন হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ খুব একটা লক্ষ করা যায় না। সমাজের নারী-পুরুষ সম্পর্ক, পারিবারিক সম্পর্ক সবই আছে কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট আখ্যান হয়ে উঠতে সেভাবে সফল হতে পারে নি। বাংলার মুসলিম চাষিদের দুর্দশার কথা লিখেছেন লেখক। একই

দশকে, একদল নিম্নবর্গীয় মানুষের দুর্দশার কথা বলেছেন প্রফুল্ল রায়। গল্পটা আলাদা হলেও মানুষগুলির সমস্যা একই। জমিদারের অত্যাচারে ওষ্ঠাগত চাষিদের প্রাণ। কোনওরকমে বেঁচে আছে। বেঁচে থাকার সামান্য অধিকারটুকুও তাদের নেই। জমিদারের দয়ায়, তাদের ইচ্ছাতেই যেন বেঁচে আছে মানুষগুলি।

মুসলিম সমাজের নারীদের অবস্থানের একটি চিত্র লেখক 'প্রেমনেই' উপন্যাসে প্রায় স্পষ্ট করেছেন। তিনটি আলাদা আলাদা পরিবার। কিন্তু তারা একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাদের জীবন কাহিনি লিখেই লেখক ক্ষান্ত থেকে একটা সুষ্ঠু পরিণতির খোঁজে বেরিয়েছেন। এখানে পূর্বের উপন্যাস রচনারীতির অনুসরণই পাওয়া যায়। সময়ের রক্তাক্ত বিষয় সেভাবে বয়ানে কোথাও প্রতিভাত হয়নি। আমরা উপন্যাসটি পাঠ করে একটি সুন্দর গল্পের আমেজ লাভ করি, আগের তথ্যের জ্ঞান আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় কিছু আধুনিক জীবনের কোনও ছবি আমরা পাই না। নারীর জীবন যন্ত্রণার ছবি পাই ঠিকই কিন্তু বিশ শতকের আশির দশকে দাঁড়িয়েও মুসলিম নারী মননে কোনও প্রতিবাদী চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ দেখাতে লেখক ব্যর্থই বলতে পারি। কোথাও কোথাও ক্ষীণ প্রতিবাদের স্বর শুনতে পাস কিন্তু সময়োপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি। উপন্যাসের চরিত্র ফুটকি প্রতিবাদ করেছে গলায় ঘড়া বেঁধে জলে ডুবে মারা গিয়ে। এতো বঙ্কিমের রোহিনীর প্রতিবাদ। সেখানেও লেখক রোহিনী মেরে ফেলেছেন সমাজের চাহিদার কাছে হার মেনে। নিজের জীবন দর্শনের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে। বিশ শতকের আশির দশকে দাঁড়িয়ে আমরা লেখকের কাছ থেকে এটা আশা করতে পারি না।

দেবেশ রায়-এর বৃত্তান্তমূলক কাহিনি অবলম্বনে রচিত উপন্যাস 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। এটিও বিশ শতকের আশির দশকে আমাদের সামনে আসে। তিস্তা পারের মানুষদের জীবন কাহিনি উপন্যাসের উপজীব্য। তিস্তার ওপর বাঁধ হয়েছে। তিস্তার বাঁধ তীরবর্তী মানুষদের মধ্যে লেখক বাঘারুকে বেছে নিয়েছেন চরিত্র হিসেবে। তার কোনও পিতৃপরিচয় নেই। নাম গোত্রহীন একটা মানুষ। গয়ানাথ জোতদার-এর মুনিষ। এখানে শ্রেণিদ্বন্দ্ব খুব পরিস্কার রূপ নিয়েছে। বাঘারা শুধুমাত্র একখানা শরীর, লেখক তাকে নির্মাণও করেছেন সেইভাবেই। মানুষকে বস্তুতেও পরিণত করেছেন। এর পূর্বে এই ভাবনা আমরা অন্য উপন্যাসগুলিতে পাই

না। পূর্বের উপন্যাসগুলিতেও সামন্ততন্ত্র আছে, ভূমিদাস আছে, মুসলিম প্রজা আছে কিন্তু তারা কেউ বাঘারু হতে পারেনি। তার কোনও ঠিকানা নেই। তিস্তার মতো সেও বয়ে চলে। সমাজের ধার সে ধারে না। বাঘারুর নির্বাক প্রতিবাদ সমস্ত মার্জিন, শিক্ষিত আধুনিক সমাজকে নাড়িয়ে দেয়। উপন্যাসের শেষে বাঘারু এবং মাদারীর ছোট ছেলেটি তিস্তারপর ছেড়ে আপলচাঁদ রিজার্ভ ফরেস্টের ভিতর দিয়ে হাঁটতে থাকে। সারারাত তারা হাঁটবে, তারপর কোথাও পৌঁছবে কেউ জানে না। লেখকও সে ব্যাপারে কোনও ইঙ্গিত দেননি। তিস্তার পার বাঘারুদের বাঁচতে দেয়নি। তাই তার নির্বাক প্রতিবাদে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। জীবনের পরিণতির কথা আমরা কেউই জানি না, চলাই জীবন। উপন্যাসের শেষেও লেখক সম্পূর্ণ অন্য রাস্তায় হেঁটেছেন, চলতি ধারণা থেকে বিচ্যুৎ হয়ে। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন—

> ''মাদারির মায়ের দারিদ্রের মধ্যেও তো কোনও গৌরব নেই, বড় বেশি অপমান আছে। সেই অপমানের বিচ্ছিন্নতাকে বিদ্রোহের বিচ্ছিন্নতা বলে ভাবার মধ্যে, তার সতকাহন বৃত্তান্ত রচনার মধ্যে, মিথ্যে কিছু থেকেই যায়। ভারতবর্ষে যারা কালি-কলম ব্যবহার করতে জানে, আমাদের মতো, তারা জানে না ভারতবর্ষের দরিদ্রতম ছ-সাত কোটির কথা কোনো অক্ষরে লেখা যায়। তাই অক্ষরজ্ঞানহীন এই বৃত্তান্ত যত লেখা হবে, ততই মিথ্যা হবে— 'সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর'। এ বৃত্তান্ত তাই এখানেই, এমন একটা যোগ্য জায়গায়, শেষ হোক।''[১০]

বাঘারুর আখ্যানে তার সম্পূর্ণ জীবনের ছবি লেখক আঁকেননি। তাদের পূর্ব পরিচয় যেমন দেননি তেমনই আবার তার পরিণতির আগেই গল্পের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। তারা বাঁচে প্রতিদিন। একটা একটা দিন তাদের কাছে সম্পূর্ণ রূপে বাঁচা। উপন্যাসের শুরু করেছেন অন্য কোনও আখ্যানের শেষ থেকে আবার শেষও হয়েছে অন্য কোনও আখ্যানের সূচনা বয়ানের সম্ভাবনা খোলা রেখেই। সমকালীন সময়, তাদের জীবন, বাঁচা-মরা আবার বাঁচার কথাই উপন্যাসে কাহিনি আকারে বর্ণিত হয়েছে। তিস্তা যেমন বয়ে চলেছে বাঘারুও হেঁটে চলেছে তার শেষ কোথায় আমরা কেউই বলতে পারি না। বিশ শতকের আশির দশকে বাংলা উপন্যাস

জগতে দেবেশ রায় একটি উল্লেখযোগ্য বয়ান আমাদের উপহার দিয়েছেন যা আধুনিক মানব জীবনের খণ্ডচিত্র উপস্থিত করেছেন।

আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে প্রায় প্রত্যেকেই নিম্নবিত্তের মানুষের সঙ্গে উচ্চবিত্তের মানুষের সংঘাত-এর কথাই ব্যক্ত করেছেন। প্রফুল্ল রায় নিম্নবর্গকে নির্মাণ করেছেন সুনিপুণভাবে। গৌরকিশোর ঘোষ নিম্নবিত্ত মুসলিম সমাজ ও তাদের সমাজের নারীকে নির্মাণ করেছেন। দেবেশ রায় তাঁর উপন্যাসে শ্রেণি বৈষম্য দেখিয়েছেন তবে শুধু শ্রেণি বৈষম্যকেই আটকে থাকেননি। সমকালীন জীবন যন্ত্রণার ছবিও এঁকেছেন। গল্পের ঘনঘটা নেই, চরিত্রের ভিত নেই, শুধুই একটা মানুষ বা একাধিক মানুষ তাদের জীবন অভিজ্ঞতাই লেখকের কলমে ভাষা পেয়েছে। একই সময়ে দাঁড়িয়ে ভিন্ন ভিন্ন বয়ানে লেখকের মানসিকতা পরিবর্তনের চিহ্ন লক্ষ করতে পারছি।

বিশ শতকের নব্বই-এর দশকে পৌঁছে আমরা নারীর রচনায় নারীর আখ্যান শুনতে পাই। এর পূর্বে অবশ্যই আমরা নারীর রচনা পেয়েছি। মহাশ্বেতা দেবীর কথা এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ট্রিলজি উপন্যাসে নারীর দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণার কথা আমরা জানতে পারি। এতদিন সে সুযোগ সেভাবে আমরা পাই না। এতদিন পুরুষ যেভাবে নারীকে দেখেছে বা দেখতে চেয়েছে তাই আমরা দেখেছি। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নারীর যন্ত্রণার অন্তরে প্রবেশ করবে এবং তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার এবং বিবরণ দেবে না এটাই স্বাভাবিক। তবেই সবাইকে একই গোত্রে ফেলা ঠিক হবে না, তবে বেশিরভাগ তাই। মহাশ্বেতা দেবী নারীর আলেখ্য বর্ণনা করেছেন ঠিকই কিন্তু সেভাবে চেতনা সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেননি। শিক্ষিত হয়ে পুরুষের পাশের চেয়ারে বসে অফিস করলেই তো আর নারীচেতনা জাগ্রত হয় না। নারী অধিকার রক্ষায় নারীরা কতটা এগিয়ে এসেছে তার পরিচয় আমরা পাই না। তাই আজও আমাদের নারীবাদ নিয়ে ভাবতে হয়, আলোচনা করতে হয়, বয়ানের বিষয় হয়ে ওঠে। অধিকার অর্জন করতে হয়, কেউ কারও হাতে স্বেচ্ছায় অধিকার তুলে দেবে এ ভাবনাই ভুল। বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সবলা' কবিতায় নারী অধিকার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে লিখেছেন,—

''নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার

কেন নাহি দিবে অধিকার

হে বিধাতা?”

(‘সবলা’ কবিতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিধাতা তো নারী অধিকার হরণ করেননি তাই তার পক্ষে অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব। নারীকে আপন জোরেই সে অধিকার অর্জন করতে হবে।

বিশ শতকের শেষ দশকে দাঁড়িয়ে নারী অধিকার রক্ষায় সমাজ কতটা তৈরি তারই পরিচয় পাই সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’ উপন্যাসে। সমাজ পরিবারের দোহাই দিয়ে, পরিবারের মর্যাদা রক্ষায়, পুরুষের মর্যাদা রক্ষায় নারীর অত্যাচার সমাজের কাছে গোপনীয় বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। নারীর হয়ে নারী প্রতিবাদ করেছে কিন্তু সেই প্রতিবাদ পুরুষ-শাসিত সমাজ ভালোচোখে দেখেনি। প্রতিবাদী ঝিনুক প্রায় সমাজ বঞ্চিত হয়েছে। এই ঘটনার পর তার পুরুষ প্রেমিক তাকে ত্যাগ করেছে। যার উপর অত্যাচারকে কেন্দ্র করে কাহিনি বিস্তার সেই সুন্দরী রমণী রমিতার স্বামীর বর্তমানের এই অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে। তার সম্মান রক্ষায় এগিয়ে এসেছে পথচলতি এক শিক্ষিত মহিলা শ্রবণা বা ঝিনুক। বিশ শতকেও স্ত্রী শুধু শয্যা সঙ্গিনী হয়েই থেকে গেছে। তার আত্মমর্যাদা রক্ষার কোনও দায়ই জীবন সঙ্গীত ওপর বর্তায় না। মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসেও সুজাতাকে, সুবর্ণকে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বারে বারে সন্তান ধারণ করতে হয়েছে। এটা একটা নারীর কাছে কতটা যন্ত্রণার তা শাসক পুরুষের বোঝার কথা নয়।

‘দহন’ উপন্যাসের বয়স্কা চরিত্র মৃণালিনী। তিনিই শেষ পর্যন্ত ঝিনুকের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সান্ত্বনার আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন। তার একটি সংলাপই তার সমর্থন বহন করে,

> ‘‘আমাদের সময়ে তোদের সময়ে কতটা কি তফাৎ হয়েছে বুঝি না বাপু। হ্যাঁ, তোরা এখন অনেক বেশি স্বাধীন, মিলিটারিতেও যাচ্ছিস, হিমালয়ে উঠছিস, ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লেখাপড়া শিখছিস, চাকরি করছিস। তবু বুকে হাত দিয়ে বলতো, সত্যি কতটা ছাড় পেয়েছিস তোরা? এটা বুঝিস না, ছেলেরা যতটা ছাড়বে ঠিক ততটাই পাবি তোরা? তার বেশি

এক চুল নয়। ছেলেরা সংসারের ভেতরে আটকে থাকা জবুথবু মেয়ে আর পছন্দ করছিল না, তাই তাদের পড়াশোনা করতে দিয়েছে। ছেলেরা একা সংসার চালাতে পারছিল না, কিংবা বলা যায়, সংসারের প্রয়োজন হল, তাই তোরা চাকরি করতে বেরোলি। বেশি দূর যেতে হবে না। তুই তোর মা-মাসিদের দ্যাখ, তাদের ওপরে ঠাকুমা দিদিমারদের দ্যাখ। তাহলেই বুঝতে পরবি কীভাবে একটু একটু করে ছাড় দেওয়া হয়েছে তোদের। এখন ছেলেরা তোদের আরও খেলামেলা দেখতে চায়। তাই টিভিতে সিনেমায় বিজ্ঞাপনে তোদের খোলামেলা হয়ে নেচে বেড়াতে হচ্ছে। ছেলেদের মন খুশি রাখার জন্য। আর সেটাকেই তোরা স্বাধীনতা ভেবে ছাগলছানার মতো লাফাচ্ছিস। এটা স্বাধীনতা নয়রে দিদি, স্বাধীনতার মরীচিকা। স্বাধীনতা হল মনের অনুভূতি। তোদের সেই মনের স্বাধীনতাটাকে ছেলেরা কখনই মানবে না। মনকেই বা কেন? আমরা সভ্য হলেও পৃথিবীতে এখনও আদ্যিকালের নিয়মটাই চলে। যার শক্তি বেশি, তার কথাই আইন। জোরটাও তার।”[১১]

লেখিকা যেন মৃণালিনী হয়ে মনের কথাগুলি এক ফাঁকে বলে নিয়েছেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের লাঞ্ছনার রীতি বদলেছে কিন্তু প্রতিকার যে হয়নি তা আমরা উপন্যাস পাঠে বা বাস্তবে চোখ রাখলেই দেখতে পাই। শুধু লেখা পড়া শিখে কিছু সংখ্যক নারী উচ্চপদে আসীন হলেই গোটা সমাজ নারীকে সম মর্যাদায় প্রতিষ্ঠাত হতে দেবে না তার জন্য প্রয়োজন গণচেতনা যার প্রকাশ আমরা বিশ শতকের শেষ দশকের বয়ানেও তেমনভাবে উজ্জ্বল অক্ষরে দেখতে পাই না। তবে মহাশ্বেতার নারী আজ অনেকটাই এগিয়েছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের হাতে এ কথা আমরা বলতেই পারি। শুধু নিম্নবর্গের সমাজেই নারী অবহেলিত, বঞ্চিত, আত্মপ্রতিষ্ঠাবঞ্চিত তাই নয়, নব্বই-এর দশকে শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত সমাজের নারীরাও নারীচেতনায় সমৃদ্ধ হতে পারেননি। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ‘দহন’ পাঠে আমরা সেই ধারণাই লাভ করতে পারি। গুটিকয়েক নারীকে শিক্ষিত করে গণ নারীর চেতনা জাগ্রত করতে শুধু শিক্ষিত

নারীই নয় চেতনা জাগ্রত করাই একান্ত কাম্য। চেতনার জাগরণই নয়, চেতনার প্রকাশও আজ জরুরি হয়ে পড়েছে। তার জন্যই নিত্য নতুন বয়ানের প্রয়োজন। সাহিত্যই পারে সমাজকে সম্পূর্ণরূপে মানুষের কথা মানুষের সামনে প্রকাশ করতে। বিশ শতকের নয়ের দশকে অন্য এক নারীর আখ্যান আমরা পাই তার নাম রাধিকাসুন্দরী। উপন্যাসের নামকরণও তারই নামে। লেখক অমলেন্দু চক্রবর্তী (১৯৩৪-২০০৯) নারী আখ্যান লিখতে বসে সমাজের খেটে খাওয়া মহিলাদের দিকে নজর ফিরিয়েছেন, যাদের আমরা পরিচারিকা আখ্যায় ভূষিত করি। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যাদের দেখলে নাক উঁচু করে। তাঁর রচনায় আধুনিক কলকাতার ছবি আছে, গড়ে ওঠা কলকাতা যেখানে বহুতল বাড়ি, বড় বড় কম্পানির অফিস, ঝাঁ চকচকে রাস্তাঘাট। সভ্যতার উন্নতির ছবি কিন্তু সমাজের কতটা উন্নতি হয়েছে, মানুষ মানুষকে কতটা সম্মান, মর্যাদা দিচ্ছে তার চিত্রটাও পাশাপাশি তুলে ধরেছেন। অজ পাড়া গাঁয়ের একটি মেয়ে রাধিকা সুন্দরী। সে পরিচারিকার কাজ নিয়ে গড়ে ওঠা কলকাতার বহুতলের একটি পরিবারে কাজ নেয়। দারিদ্রের কারণে সে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় আসে। কিন্তু এখানেই যদি শেষ হত তাহলে বোধহয় ভালই হত। সে গিন্নিমা কিরণময়ীর স্নেহেই বড় হচ্ছিল। কিন্তু এখানেও বাদ সাধে সেই পুরুষের যৌন আকাঙ্খা। কিরণময়ীর বড় ছেলে বাবন রাধার জীবনে অবাঞ্চিত ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেলে। এখানেই নারীর অপমান শেষ হয়ে যায়নি। এই ঘটনার পর বাবন রাধার হাতে পাঁচশো টাকা গুঁজে দেয়। এর থেকে বড় অপমান একটা নারীর জীবনে কি হতে পারে। পুরুষ শুধু ভোগ করে, টাকা দিয়ে, দারিদ্রের সুযোগ নেয়। এরপর রাধা গ্রামের বাড়িতে ফিরে যায়। সেখানে তার বিবাহের সম্বন্ধ হয়। বিয়ে না করে সে আবার পালিয়ে আসে শিবচন্দ্র নামে একটি ছেলের সঙ্গে কলকাতার এক বস্তিতে। সেখানে পরী নামের একটি বন্ধু জোটে। এর পরের জীবনই উপন্যাসের মূল।

লেখক রাধার জীবন বলতে গিয়ে অনেক অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন। বস্তির ভাষাও ব্যবহার করেছেন। পূর্বের শরৎ উপন্যাসে আমরা এরকম নারী চরিত্র পাই তবে তাদের প্রকাশ অনেক মার্জিত, অনেকটা ঢাকা দেওয়া। লেখক অমলেন্দু চক্রবর্তী সেই রাখঢাক মেনে নিতে

পারেননি। রাধার যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে লেখক লিখছেন,

> ‘‘হাত পুড়ছে, পা পুড়ছে, চোখ পুড়ছে, মাথার চুল পুড়ছে বুক পুড়ছে, পাছা পুড়ছে যোনি পুড়ছে জঙ্ঘা পুড়ছে যৌবন পুড়ছে বয়স পুড়ছে সাধ পুড়ছে—তার বেঁচে বরতে থাকার সবটুকুই ঝালমশলায় কুরে কুরে খাচ্ছে কেউ। পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে সে, যেখানে যেখানে সে যতটুকু মেয়েমানুষ জ্বলেপুড়ে মাংসপিন্ডে দলা পাকিয়ে মরে যাচ্ছে না। লুট হয়ে যাচ্ছে।’’[১২]

অর্থাৎ পুড়ছে শুধু মেয়ে মানুষ। যেখানে যতটুকু মেয়েমানুষ—এই কথার মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারি মানুষ হয়েও মেয়ে মানুষ যেন অন্য জগতের প্রাণী। পুরুষ মানুষের খাদ্য দ্রব্য। বিশ শতকের আধুনিক সমাজের শেষ লগ্নে দাঁড়িয়ে লেখকের অনুভবে, দর্শনে আমরা বুঝতে পারি নারী সে যে সমাজের, যে বর্ণের, যে বিত্তের হোক না কোন পুরুষ তাকে ভোগ করবে এবং জ্বলে পুড়ে মরবে।

‘দহন’ উপন্যাসে আমরা দেখেছি একটি উচ্চবিত্ত সমাজের নারীর কথা, তারা শিক্ষিত, মার্জিত, তথাকথিত উচ্চবংশজাত। সেখানেও লেখিকা কলকাতার কথাই বলেছেন। একজন নারী তার স্বামীর উপস্থিতিতে অপমানিত হয়, তাতে স্বামীর অপমান বোধ জাগে না কিন্তু যখনই নারী প্রতিবাদে সামিল হয় তখনই পুরুষ স্বামী অপমানের জ্বালা সইতে পারে না। রাধিকা সুন্দরী উপন্যাসের বস্তির মেয়ে মানুষ পরী যখন প্রতিবাদে মুখর হয় তখনই শিবচন্দ্র ভয় পেতে থাকে। কিন্তু তার কোন চেতনার পরিবর্তন হয় না। মূলত পরীর উদ্যোগেই শিবচন্দ্র বাধ্য হয় রাধাকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ঘরে তুলতে। অর্থাৎ লেখক একানে কিছুটা হলেও আশা জাগিয়ে উপন্যাস শেষ করেছেন। ‘দহন’ উপন্যাসে আমরা নারীর চোখে নারীকে দেখেছি, ‘রাধিকাসুন্দরী’ উপন্যাসে পুরুষের চোখে নারীকে দেখেছি। একজন দেখেছেন উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজের নারীর অবস্থান, অপরজন বস্তিবাসী নারীর অবস্থান দেখিয়েছেন। তবে উভয়ের চোখেই নারী ‘মেয়েমানুষ’ হয়েই থেকেছে। সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের যাত্রা সম্পূর্ণ

মানুষেরই খোঁজে।

বিশ শতকের শেষ দশকে আমরা একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস পাই সমরেশ বসুর হাত ধরে। এর পূর্বে তিনি 'গঙ্গা', 'বিবর' লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। বিশ শতকের শেষ দশকে এসে পেলাম 'দেখি নাই ফিরে'। জীবন্ত মানুষের কথা। তিনি শিল্পী মানুষ। বাঁকুড়া জেলার এক অখ্যাত গ্রামের 'লাপিত' বংশের সন্তান। এখানেও নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্গের সমাজে লালিত পালিত একজন মানুষ তিনিই যুবা বয়সে এসে পড়েছেন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে তার ভাস্কর্য গুণে বিশ্বকবি গুগ্ধ হলেও সেখানকার অন্যান্য বিদ্যোৎজনেরা তাকে অবহেলা, লাঞ্চনাই দিয়েছে। তবুও তিনি হার মানেন নি। সমাজের নিম্নবর্গের মহিলাকে বিবাহ না করে সহধর্মীনীর মর্যাদা দিয়েছেন। সমাজে প্রতিষ্ঠাও দিয়েছেন সমাজপতিদের পাশে। লেখকের জীবনের দুঃখ যন্ত্রণাকে যেন রামকিঙ্কর নামক চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখক প্রকাশ করতে চেয়েছেন। যিনি 'বিবর' লিখে উপন্যাসের ছাঁদ পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন তিনিই আবার লিখছেন আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস। তবে বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের উপন্যাস এর আগে আমরা পাই না। একদিক থেকে এটি জীবনী মূলক উপন্যাসও। সরাসরি কোন জীবিত ব্যক্তির জীবন নিয়ে উপন্যাস আমরা বিশ শতকের শেষ দশকেই পাই। সমস্ত লেখকই তাঁর ভাবনাকে মনের কথাকে সরাসরি বা কোন চরিত্রের মোড়কে প্রকাশ করেন। শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে লেখকের কথাই বলেছেন তবে সরাসরি নয়, চরিত্রের আড়ালে কাহিনির মোড়কে। লেখক সমরেশ বসুর জীবনের সঙ্গে রামকিঙ্করের জীবনের মিল খুঁজে পেয়েছেন।। তার তাকেই অবলম্বন করে রামকিঙ্করের সমাজ পরিবেশ, সেখানকার মানুষজন তার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ, সেখানকার মানুষজন এর কথাও বলেছেন। এখানেও নিম্নবিত্তের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সমাজপতিদের ব্যঙ্গ তাকে সহ্য করতে হয়েছে। তবে সমাজে আজও কিছু মানুষ আছেন যাঁদের সহায়তা, সাহায্য এই নিম্নবর্গকে সমাজের মূল স্রোতে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিল্পীর জীবন যন্ত্রণা উপন্যাসে বারে বারে প্রকাশিত হয়েছে যা লেখকের জীবন যন্ত্রণারই সামিল। একজন ভাষা শিল্পী অন্য এক ভাস্কর শিল্পীর জীবনের কথাই উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। ব্যক্তিজীবন ও শিল্পী জীবনের কথা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সাঁওতাল

সম্প্রদায়কে নিয়ে এত কাজ আর কোন শিল্পী করেন বলে লেখকের মত। এটাও তার একটা প্রতিবাদ। সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছে তার শিল্পীত প্রতিবাদ। বিশ শতকের শেষ দশকে যখন দেশে, সমাজে যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষ, নারী-পুরুষ উভয়ই। সেই সময়ে আমরা দেখতে পাই 'দহন' রাধিকা সুন্দরী'র মত উপন্যাস আর এর ঠিক পাশাপাশিই আমরা পাই 'দেখি নাই ফিরে'-র মত উপন্যাস। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবন যন্ত্রণা, দুঃখ কষ্ট-র ছবি বিভিন্ন বয়ানে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের কলমে Text হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। আমরা সম্পূর্ণ অন্য সময়ে দাঁড়িয়ে তার বিচার করতে বসে সেই সময়কে ধরতে চাই। এটাও বুঝতে চাই বয়ানগুলি কতটা সময় উত্তীর্ণ করতে পেরেছে। বর্তমান সময়েও এই পরিস্থিতি আমরা আমাদের চারপাশে লক্ষ করি তাই আজও আমরা তার বিচার বিশ্লেষণ করতে বসি।

তথ্যসূত্র

১। সম্রাট দত্ত ঞ্ঝ 'বিশ শতকের আখ্যানতত্ত্বের প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাস', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১০, পৃঃ-১৮।

২। প্রফুল্ল রায় ঞ্ঝ 'আকাশের নীচে মানুষ' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৮১, পৃঃ-১২৯।

৩। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঞ্ঝ 'বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১১, পৃঃ- ১৯।

৪। সত্যেন্দ্রনাথ রায় ঞ্ঝ 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০০, পৃঃ-১৩।

৫। ঐ, পৃঃ-১৬।

৬। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঞ্ঝ 'বাংলা উপন্যাসের রূপ ও রীতির পালাবদল' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০১১, পৃঃ- ৩০।

৭। ঐ, পৃঃ- ১০৯-১০।

৮। দেবেশ রায় ঞ্ঝ 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৬, পৃঃ-৯০।

৯। দেবেশ রায় ঞ্ঝ 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৬, পৃঃ-৯০।

১০। দেবেশ রায় ঞ্ঝ 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা ১৯৮৮, পৃঃ-৪৯১।

১১। সুচিত্রা ভট্টাচার্য ঞ্ঝ ' দহন' আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৪, পৃঃ-১৬৬-৬৭।

১২। অমলেন্দু চক্রবর্তী ঞ্ঝ 'রাধিকাসুন্দরী' (৩য়) দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা ১৯৯৭, পৃঃ- ২৯৪।